2/6
3/240
1/201
2/262
NB 1.3

সত্যপ্রাণ

বিজয়কৃষ্ণ

LIBRARY
No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS
PRESENTED

শ্রীশিবেন্দ্র নাথ ঘোষ

প্রকাশক—
শ্রীরঞ্জিত কুমার মজুমদার
১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড,
কলিকাতা-৩১। ৩রা কার্তিক ১৩৮১
২২. ১০. ৭৪

মূল্য : দুই টাকা মাত্র

মুদ্রক—
যুগবার্তা প্রেস,
৫/১ বুদ্ধু ওস্তাগর লেন,
কলিকাতা-৯।

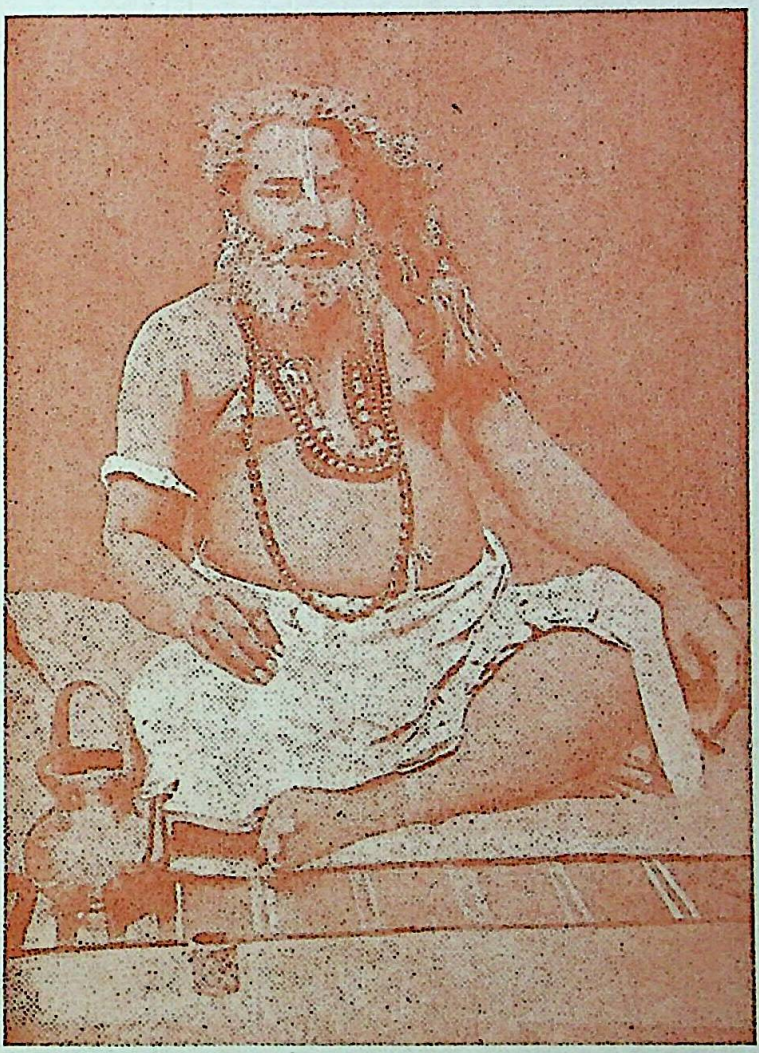

সত্যপ্রাণ

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

LIBRARY 3/240
No. 2/608
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.
PRESENTED

ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় লেখকের এই রচনাটির বিশেষ একটি মূল্য আছে বলিয়া মনে করি। এই ক্ষুদ্র-পরিসর পুস্তিকায় তিনি গোস্বামী প্রভুর বহুমুখী জীবন প্রবাহের যে মূলগত ধারাটির কথা বলিয়াছেন, তাহা হইল সত্য। আবির্ভাব হইতে তিরোভাব অবধি গোঁসাইজীর জীবনের প্রবাহ অবিমিশ্র সত্যের মধ্য দিয়া। তিনি সত্যময়। সেই কারণেই, গোঁসাইজীর মাতা-ঠাকুরাণীর তথা-কথিত উন্মাদাবস্থা তৎ-পিতৃ কর্তৃক জনৈক ফকিরের নিকট প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কারণ বলিয়া যে প্রচলিত ধারণা আছে, লেখক তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অসত্যের সংস্পর্শ যেখানে সেখানে গোঁসাইজীর আবির্ভাব হইতেই পারে না। তারপর, গোঁসাইজীর জীবনের একটা বিরাট অংশ ব্রাহ্ম-সমাজ লইয়া। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত অবস্থা ও তৎ-উত্তর সদ্-গুরু অবস্থাকে পরস্পর-বিরোধী বলিয়া বহু বিতর্কের ও সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। লেখক অতি সরল দৃষ্টিতে এই বিরোধের ভিত্তিহীনতার প্রতি গূঢ় ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে গোঁসাইজীর ব্রাহ্ম-সমাজ সত্য-ধর্ম সমাজ। কোন দলীয় ব্যাপারই নয়। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে থাকাকালীন গোঁসাইজী নিজেই বলিয়াছেন, "আমরা প্রকৃত সত্য ধর্মকে ব্রাহ্ম ধর্ম বলি।" বস্তুতঃ গোঁসাইজীর প্রচলিত জীবনী-গ্রন্থগুলিতে তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজ ভুক্তি সম্বন্ধে কোন একটা থিয়োরী বিশেষ পাওয়া যায় না। শুধু বিপিন পাল মহাশয় তাহার ব্যতিক্রম। তাঁহার মতে বর্ত্তমান যুগের সমস্ত কিছু বিরোধের মধ্যে স্বয়ং গিয়া গোঁসাইজী সে সকলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সাধন করিয়াছেন। লেখকেরও মনে হয় প্রকারান্তরে তাহাই মত। তবে তিনি নিজভাবে এটিকে বর্ণনা করিয়াছেন,—শ্যামসুন্দরের শ্যামল হস্ত গোঁসাইজীকে সত্যের পথ ধরিয়া পরিচালনা করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার জীবনে বস্তুতঃ কোনখানেই বিরোধ নাই, কোনখানেই অসঙ্গতি নাই।

গোঁসাইজীর যে ব্রাহ্ম-ধর্ম, সত্য ধর্ম, তাহা হইতে কোনদিনই তিনি বিচ্যুত হন নাই। সদ্-গুরু রূপে প্রকাশিত হইবার পূর্বেও নয়। এইটেই আমার মনে হয় লেখকের মূল বক্তব্য। তবে প্রবন্ধে তিনি আরও দু' একটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। যথা গ্রন্থারম্ভেই গোঁসাইজীর সপ্ত-লহরী মালা ধারণ প্রসঙ্গ। আমরা 'মিশনারী' বলিতে যা বুঝি গোঁসাইজী যে তা ছিলেন না, তাহাই বলা বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য। সদ্‌গুরু গোঁসাই-এর ভাগবতী-তনুর অপ্রাকৃতত্বের ইঙ্গিতে প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি মধুর হইয়াছে।

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.

LIBRARY 3/240
No. ৭/৫৮৫
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.
PRESENTED

সত্যপ্রাণ বিজয়কৃষ্ণ

নিছক বিজয়কৃষ্ণের কথাই লিখিব এই মনন করিয়া আমি কোন-দিনই কোথাও এই মহাপুরুষের কথা লিখি নাই। কেননা আমার গুরুবর্গ অমৃতলাল সেন, জগদ্বন্ধু মৈত্র, বঙ্কুবিহারী কর, বিপিন চন্দ্র পাল, নবকুমার বাগচি, হরিদাস বসু, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, ঠাকুর বরদাকান্ত, অমিয় সান্ন্যাল, মহেশ চন্দ্র দে সরকার, দ্বারকা নাথ রায়, এবং সতীর্থ বিষ্ণুচরণ দাস ইত্যাদি বহুব্যক্তি তাঁহার বিষয় বহুকথা লিখিয়াছেন এবং দেশ বরেণ্য বহুব্যক্তি উহা লইয়া সমালোচনাও করিয়াছেন যথেষ্ট। তদুপরি আমার লেখার কোন আবশ্যকতা আছে কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু সদ্য প্রকাশিত একখানি বই পড়িতে পড়িতে লেখকের দুই একটি মন্তব্য চোখে পড়িল বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে। তিনি লিখিয়াছেন বিজয় কৃষ্ণের গলায় সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ চিহ্ন স্বরূপ রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ, তুলসী, স্ফটিক, প্রবাল, বিল্বমূল ও চন্দনের মালা বিরাজ করিত। ১২/১৩ বৎসর পূর্ব্বে বহরমপুরে এক গৌড়ীয় বৈষ্ণব বাবাজী প্রমুখাৎও ঐরূপ একটি সাম্যবাদ সূচক মন্তব্য শুনিয়াছিলাম। তাহাদের ঐ ধারণা বা সিদ্ধান্ত সর্বৈব অমূলক। বিজয়কৃষ্ণ বহু ধর্মের বহু সম্প্রদায়ের বহু সাধু মহাত্মাদের সঙ্গ করিয়াছেন সত্য, এবং যেখানে যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন উহাও সত্য। কিন্তু কোথাও তিনি সংস্কারবদ্ধ বা সম্প্রদায়ভুক্ত হন নাই। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন, "সকল সম্প্রদায় তোমার, তুমি কোন সম্প্রদায়ের নও।" (সংস্কার থাকিতে মুক্তির আশা সুদূর পরাহত।)

বৈষ্ণবমালা ধারণ প্রসঙ্গে শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থের ৪র্থ বিলাসের ১১৮ শ্লোক নির্দ্দেশ দিয়াছেন—

ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েত্তুলসী দলৈঃ
পদ্মাক্ষৈস্তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলৈধাত্র্যাশ্চ নির্ম্মিতাঃ
ধারয়েত্তুলসী কাষ্ঠ ভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ॥ ইত্যাদি

উক্ত চারি প্রকার মালা ব্যতীত অন্যান্য মালা ধারণের যৌক্তিকতা এই যে উহাদের প্রত্যেকটি এক একটি বিশেষ গুণসম্পন্ন এবং স্বয়ং নিত্যানন্দপ্রভু উহার পথ প্রদর্শক। তিনি মণি, মুক্তা, প্রবাল, রুদ্রাক্ষ ও বিভাক্ষ ধারণ করিতেন। গৌর ব্যতীত তাঁহার দ্বিতীয় সম্প্রদায় ছিল না। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে বিজয়কৃষ্ণের কণ্ঠে যে সপ্তলহরী মালা শোভা পাইত উহা সম্প্রদায়ের সংস্কার বশতঃ বা সকল সম্প্রদায়ের একটি এভারেজ (গড়) কষার জন্য নহে। তারপর তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ যেখানেই যাহার সাথে মিলিয়াছেন কখন অন্য কর্তৃক চালিত হন নাই। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ভগবানদাস বাবাজী বলিয়াছেন, "ব্রাহ্ম সমাজেও প্রভু আমার আচার্য।" তিনি আর একটি কথাও বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মজ্ঞানী না হইলে কি ভক্তির অধিকারী হওয়া যায়!"

ব্রাহ্ম সমাজের অধিকর্ত্তা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা কেশবচন্দ্র সেন বা অন্য ধর্ম্মের বা সম্প্রদায়ের কাহারও কখন মন যোগাইয়া তিনি চলেন নাই। অন্যপক্ষে তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান দিতেও কখন কার্পণ্য করেন নাই।

বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্ম ও তাহার উৎস

বিজয়কৃষ্ণ বলিতেন সত্যই ধর্ম্ম।

সত্যমেব পরং ব্রহ্ম
সত্যং জ্ঞানমনন্তং
সত্যং বিজয়তে লোকং
সত্যরূপং জনার্দ্দনম্।

উপনিষৎ উক্ত সত্যং শৃণোমি, সত্যং স্মরামি, সত্যং করোমি, ব্রবীমি, বেদ্মি এই ছিল বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্ম ও ধারা। তিনি শৈশব হইতে দেহরক্ষা পর্য্যন্ত এই সত্যের সেবা করিয়াছেন—আবশ্যকতা বোধে দিক পরিবর্তন করিয়াছেন, তিনি লক্ষ্য পরিবর্তন করেন নাই। এইটিই ছিল এই মহাপুরুষের বহুমুখী কর্ম্মজীবনের বিশেষত্ব। পাঠ পরিবর্তন দ্বারাই শিক্ষার অগ্রগতি সূচিত হয়।

বিজয়কৃষ্ণ চলার পথে যে চটিতে বা পান্থশালায় অবস্থান করুন না কেন তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ঐ অত্যুন্নত বদ্‌বিশালের প্রতি। তাঁহার পথ প্রদর্শকও ছিলেন একই অনাদি পুরুষ গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর এবং তাঁহার সাধনার মন্ত্রও ছিল একটিই "সত্যং ধীমহি—আদিতে ও অন্তে।

তিনি আসিয়াছিলেন শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর দশম পুরুষে ১২৪৮ সনের ১৯শে শ্রাবণ (২রা আগষ্ট ১৮৪১ খ্রীঃ) ঝুলন পূর্ণিমার দিন, বৃক্ষতলে। পিতা আনন্দকিশোর ছিলেন পরম ভাগবত। তিনি যখন ভাগবত পাঠ করিতেন তখন তাঁহার শরীরের রোমকূপ হইতে রক্তোদগম হইয়া উত্তরীয় বসনখানি করিয়া দিত রক্তরঞ্জিত। তাই শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "অমন বাপের ছেলে না হলে এমন ভক্ত ছেলে হয়!" মাতা স্বর্ণময়ীর হৃদয়টি ছিল যেন দয়ায় গড়া—তাঁহার প্রাণ না কাঁদিত প্রাণী জগতে এমন কোন প্রাণী ছিল না, এমন কি ভূতযোনী পর্যন্ত বাদ পড়িত না। এমন দয়ার কথা সাধুসন্তের ভিতরও কম শুনা যায়। শুধু তাহাই নহে, তিনি ছিলেন জীবন্মুক্ত। দুঃখের বিষয় তিনি সময় সময় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িতেন। উহার কারণ দর্শাইতে পূজ্যপাদ নবকুমার বাগচি মহাশয় "শ্রীবিজয় কথামৃতে" লিখিয়াছেন, "প্রভুজীর মাতামহ গৌরীপ্রসাদ জোদ্দার মহাশয়ের অর্থ বিত্ত সব কিছু ছিল—ছিলনা তাঁহার কোন সন্তান। সকল সুখের ভিতর এইটিই ছিল তাঁহার দুঃখ। তাই জোদ্দার মহাশয় একদিন এক শক্তিমান মুসলমান ফকিরের নিকট যান। ফকির সাহেব তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিলেন, "তোমার প্রথম সন্তানটি যদি আমাকে দাও তবে এ বিষয়ে আমি ভাবিয়া দেখিতে পারি।"

জোদ্দার মহাশয় ইহা শুনিয়া চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—যদি সন্তান হয় তখন ফকির সাহেবের হাত পা ধরিয়া সন্তানটিকে ঘরে রাখিবেন। এই মনে করিয়া জোদ্দার মহাশয় ফকির সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেই ফকির সাহেবের প্রসাদে জোদ্দার মহাশয় প্রথমে যে সন্তানটি লাভ করিলেন তিনিই স্বর্ণময়ী দেবী। কন্যাটি জন্ম গ্রহণের পর জোদ্দার মহাশয় ফকির সাহেবের নিকট অনেক কাঁদাকাটি করিয়া তাঁহাকে কিছু বৃত্তি স্থির করিয়া দিলেন ও কন্যাটিকে ঘরে রাখিলেন; কিন্তু অনেক দিন পরে সে বৃত্তি বন্ধ হওয়ায় ফকির সাহেব ক্ষেপিয়া যান—তারপর হইতে স্বর্ণময়ী দেবী অপ্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন।" সত্য বলিতে কি একথাটি আমার মন মানিয়া নিতে আগ্রহী নয়। ঐ কথাটিতে প্রকাশ পায় যে জোদ্দার মহাশয় পূর্ব হইতে একটি মিথ্যা পরিকল্পনা তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু জীবন্মুক্ত কোন পুরুষ মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীতে আসেন নাই। এ জন্য বিনীত ভাবে এ বিষয়ে আমি আমার একটি মন্তব্য রাখিতেছি—সাধুজন উহা বিচার করিয়া দেখিবেন। এরূপ কখন কখন ঘটে যে মানুষ একে অন্যকে এমন একটি কথা দিয়া থাকে যাহা পরবর্তীকালে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। যুধিষ্ঠির নিজেকে পণে হারিয়া দ্রৌপদীকে রাখিলেন পাশার পণ যুধিষ্ঠির তখন ভাবিতে পারেন নাই যে সে পণ রাখার অধিকার তিনি তাহার পূর্বেই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। দ্রৌপদী স্বেচ্ছায় সে পণ রক্ষা না করিলে যুধিষ্ঠিরকে অসত্যে লিপ্ত করার সঙ্গত কারণ থাকিত বলিয়া আমার মনে হয় না। বলিরাজও ছলনাময় ভগবানকে কতকটা এমন ইঙ্গিত যে না দিয়াছিলেন তাহাও নহে। ভগবান তাহার কোন উত্তর দেন নাই। নিঃসন্তান জোদ্দার মহাশয়ের বংশ রক্ষার্থ সন্তান কামনা, তাহা পুত্রের জন্য, কন্যার জন্য নয় ইহা ধরিয়া লইলে অযৌক্তিক হইবে বলিয়া মনে করি না। একে হইয়া গেল আর—জন্ম হইল কন্যার। কন্যা সন্তানকে ফকির সাহেবের হাতে দেওয়ার কথা স্বভাবতঃই জোদ্দার মহাশয়ের মনে না ওঠারই কথা। পুত্র হইলে কোন প্রশ্নের অবতারণা

হইত না বোধ হয়। ইহা ভগবানের এক লীলাচাতুর্য যাহা জীবনকৃষ্ণের জীবনে পদে পদে লক্ষিত হয়।

এই প্রসঙ্গে স্বর্ণময়ী দেবীর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার লক্ষণগুলি আমাদের অনুধাবনীয়। একদিন তিনি ব্রহ্মচারীজীর পেছনে পেছনে ছুটিয়া ছিলেন ঝাড়ু-পেটা করার জন্য। তাঁহার উন্মত্ততার কারণ ছিল—ব্রহ্মচারীজী ছেলে হয়ে পতির সাজে সজ্জিত কেন? ইহার অর্থ চিরদিন অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত যদি না বিজয়কৃষ্ণ বলিয়া দিতেন যে ব্রহ্মচারীজীর রুদ্রাক্ষ ত্রিপুণ্ড্রকাদি ধারণ ছিল আশুতোষেরই সাজ (আভরণ)। ব্রহ্মচারীজীর সে বেশের সম্মান দেবার জন্য পার্বতী তখন তাহার অনুসরণ করিতেছিলেন পদে পদে। দেবীর এই অপ্রকৃতিস্থরূপ প্রকাশ যে সাধনার একটি বিশেষ উচ্চস্তর তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভারতে ঋষভদেবের এই অবস্থার বর্ণনা আছে।

একবার দেবী স্বর্ণময়ী উন্মাদ অবস্থায় শান্তিপুর হইতে একাকিনী ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলে, বিজয়কৃষ্ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি এতটা পথ একা একা এলে কি করে?" তদুত্তরে দেবী বলিয়াছেন "আমাকে সকলে পাগলা গারদে দিতে চেয়েছিল। আমি ভয় পেয়ে শ্যামসুন্দরকে বললাম—তুমি আমাকে আমার ছেলের কাছে রেখে এস শ্যামসুন্দর বলল—তোর ছেলে কোথায়? আমি বললাম, আর চালাকি করতে হবে না—শীঘ্র নিয়ে চল্। তখন তোকে দেওয়ার জন্য তাঁহার গাত্রবস্ত্র আমার হাতে দিয়ে, আমাকে ঢাকায় রেখে গেল।" বিজয়কৃষ্ণ সে বস্ত্র মাথায় রাখিয়া ভাবস্থ হইলেন।

বিজয়কৃষ্ণের বাল্যবন্ধু

বিজয়কৃষ্ণ তখন অবুঝ বালক। একদিন সে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরকে কোলে বসাইয়া দুগ্ধ পান করাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করায় মা সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "জন্মাষ্টমীর দিন শ্যামসুন্দরের জন্ম হইবে, সেই

দিন তুমি তাহাকে দুগ্ধ পান করাইও।" জন্মাষ্টমীর দিন ঐটুকু বালক দুগ্ধের বাটি লইয়া বসিয়া রহিলেন—সারা রাতে আর চোখ বুঁজিলেন না। অপর একদিন বালক বিগ্রহের মুখে দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া বিগ্রহকে কোলে লইয়া শয়ন করিয়া আদর করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে দেখিতে পাই বালকের সাথে খেলিবার জন্য শ্যামসুন্দর সিংহাসনের আসন হইতে নামিয়া আসিতেন খেলার মাঠে এবং ভাটা চুরি করিয়া আশ্রয় নিতেন সিংহাসনের আসনে—যে গণ্ডির ভিতর সখ্য ভক্ত সাধারণতঃ যাইতে ইচ্ছা করে না। ৫/৬ বছরের বালক বিজয় প্রহ্লাদ চরিত্রপাঠ শুনিয়া একদিন কাঁদিয়া আকুল হইাছিলেন। এইখানেই বালক বিজয়কৃষ্ণের ধর্মজীবনের উন্মেষ বা জন্মান্তরীণ লগ্নীকৃত সুখভোগের প্রারম্ভ—নূতন অর্থ বা সামর্থ্য নিয়োগ না করিয়া। বিজয়কৃষ্ণের নিম্নোক্ত উক্তিগুলি উহার সাক্ষ্য বহন করে।

রামগয়ায় গিয়া আমার মনে হইল—আমি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নহি; অন্য কোন ব্যক্তি। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমি আমার ঐ মনোভাব দমন করিতে পারিলাম না। নিকটে একটি বৃক্ষতলে একজন অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে যে দুইটি সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁহারা কোথায় গেলেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন—কিস্‌কো বাত্ পুছতা হায়? সো লোগত বহুৎ পহেলে মর গিয়া। জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে নৃসিংহদেবের মন্দির আছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন—হায় মিলেগা। মন্দিরে পৌছিয়া উহার ভিতর প্রবেশ করা মাত্র আমার পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সেখানে আমি (পূর্বজন্মের আমি) ব্যতীত আর দুই সন্ন্যাসী বাস করিতেন। যে ঘরে বাস, শয়ন, পাঠ আহার ইত্যাদি হইত সকল মনে পড়িয়া গেল, মনে পড়িয়া গেল নিকটস্থ পুষ্করিণীর কথা। মনে পড়িয়া গেল একটি বট বৃক্ষের কথা যাহার গাত্রে লিখিয়াছিলাম—ওঁ রামঃ। ঐ লেখার অক্ষরগুলি টেরা বাঁকা হইয়া গেলেও লেখাটা

তখনও সুস্পষ্ট। (গয়া-অবস্থান কালে মহাপ্রভু এখানে অবস্থান করিতেন।)

সুতরাং ইহা সহজ অনুমেয় যে শ্যামসুন্দর ও বিজয়কৃষ্ণের সখ্যটি নূতন কিছু নয়।

গুরু গৃহ

গাছে থাকিয়াই ফুল ফোটে, বৃন্তচ্যুত কুঁড়ি যায় শুকাইয়া। বালক বিজয়কৃষ্ণের চিত্ত বিকাশ হইয়াছিল মাতৃক্রোড়ে। তিন বৎসর ছয় মাস বয়সে বিজয়কৃষ্ণের পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার বুদ্ধি বিকাশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল ভগবান দাস সরকার মহাশয়ের পাঠশালায়। তিনি একবার যাহা পাঠ বা শ্রবণ করিতেন, তাহাই কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। সরকার মহাশয়ও ছিলেন এক মৃত্যুঞ্জয়ী সাধক। একদিন পাঠশালা ছুটির সময় সরকার মহাশয় বলিয়া দিলেন, "ওরে ছোঁড়ারা, কাল সকালে আসিস্। একসঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যাবো, সেখানেই আমি দেহত্যাগ করব।" রাত্রিতে এ সংবাদ শান্তিপুরময় ছড়াইয়া পড়িল। পরদিন প্রাতে পাঠশালায় বহু স্ত্রী পুরুষ, বালকবৃদ্ধ সমবেত হইল। গুরুমহাশয় সকলকে প্রণাম করিয়া ও তাহার পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া ধীর পদে গঙ্গাযাত্রা করিলেন। গঙ্গায় গিয়া প্রথমে স্নান, আহ্নিক করিয়া, সকলকে প্রণাম করিয়া, গঙ্গার জলে বসিয়া জপ্ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে সংকীর্তন হইতে লাগিল। গুরুমহাশয় বলিলেন, "বাপ সকল, আমি কায়স্থ, তোমাদের ভিতর অনেকেই ব্রাহ্মণ সন্তান। আমি তোমাদিগকে কত তাড়না করিয়াছি—আজ সকলে তোমরা আমার মাথায় পা দাও—আমার আর বেশী দেরী নাই। ঐ দেখ আমার রথ এল। এ হেন গুরুমহাশয় বিজয়কে সমধিক স্নেহ করিতেন শুধু বিজয়ের মেধার জন্য নয়। সেই উন্নত সাধক একটি ফুটন্ত ফুলের গন্ধ ও সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন ঐ অফুটন্ত বিজয়কৃষ্ণের বাল্য চরিত্রে। ভগবান গুরুমহাশয়ের দেহান্তের

পর বিজয়কৃষ্ণ কিছুদিন হেজেল সাহেবের স্কুলে সংস্কৃত বিভাগে পাঠ করেন। এখানে বালকের চিন্তাধারার সহিত পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংমিশ্রণ হওয়া অসম্ভব নয়।

কৈশোরের অপ্রতিহত উদ্যম

বিজয়কৃষ্ণ বয়সে ছোট হইলেও পাড়ার সকল দুষ্টামির ছিলেন গুরুদেব। বাল্যকালে বিজয়কৃষ্ণ সঙ্গিগণের সহিত ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসিতেন। ইহা একটি তাহার প্রিয় খেলা ছিল। এই খেলার সাধ মিটাইবার জন্য না বলিয়া পরের ঘোড়া ধরিয়া চড়া ব্যতীত নান্যপন্থা। শান্তিপুরের ঘোড়ার মালিক সবাই ছিলেন বাঘা বাঘা ব্যক্তি। যখন যেদিন ঘোড়াচুরি ধরা পড়িত বিজয়কৃষ্ণের সাঙ্গপাঙ্গগণ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিত। বিজয়কৃষ্ণ কখন পলায়ন করিয়া সত্যের অপলাপ করেন নাই বরং সত্য ও সাহসের পরিচয় দিয়া সেই সেই বাঘা ব্যক্তির হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। বালোর চাঞ্চল্যের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও কর্মকুশলতা। এই দুইটি হাতিয়ার লইয়া যেখানে যখন সমাজ সংস্কার বিষয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন বালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শক্তি কখন দাঁড়াইতে পারে নাই। কৈশোরে মদ্যপায়ী বন্ধুর বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে করিয়াছেন চরিত্রবান্। স্ত্রী স্বাধীনতায় তাঁহার দৃঢ় ও সংযত পদক্ষেপে সমাজ জীবনে আনিয়াছিল এক যুগান্তর। গুরু-গিরির পরিবর্তে যে অশুভ জমিদারি মনোভাব দেখা দিয়াছিল অদ্বৈত পরিবারে তাহার মূলে তিনি করিয়াছিলেন নির্মম কুঠারাঘাত। শেষ জীবনে পুরীতে বানর বধ বিরুদ্ধে তিনি যে সংগ্রাম করিয়াছিলেন উহা কোন ধর্মার্থীই জীবনে ভুলিবেন না। বিজয়কৃষ্ণ তাহার নৈতিক ধর্ম জীবনের পাঠ শেষ করিয়াছিলেন কৈশোরে।

সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ ও অদ্বৈত ভাবধারা

শান্তিপুরে গোবিন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের টোলে বিজয়কৃষ্ণ এক বৎসরে সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণখানি শেষ করিলেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে কলিকাতা আসিয়া তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইয়া বেদান্ত চর্চায় মনোনিবেশ করিলেন। বেদান্ত এমন একটি জিনিষ যে উহা কাহাকেও একটিবার নাড়াচাড়া না দিয়া ছাড়ে না। বিজয়কৃষ্ণও রেহাই পাইলেন না। বেদান্ত চর্চা করিতে করিতে ক্রমে তিনি ঘোর বৈদান্তিক হইয়া পড়িলেন। বিজয়কৃষ্ণ চরিতকার নবকুমার বাগচী মহাশয় বলিয়াছেন "ব্রাহ্ম সমাজে পরীক্ষিত বিষয়" নামক পুস্তকে বিজয়কৃষ্ণ লিখিয়াছেন, "তখন সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্ম এই সত্য বিশ্বাস করিতাম। উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না।" পাঠক ভাবিয়া দেখিবেন—বিজয়কৃষ্ণের এই পরিবর্তন সঙ্গদোষে নয়—সঙ্গগুণে—এটি তার বংশের গৌরব। বেদান্ত পাঠের সাফল্যের প্রথম স্তর সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ব্রহ্মের পূজা করিতে হইলে ব্রহ্মভাবাপন্ন হইতেই হইবে। অদ্বৈত রক্ত যাহার ধমনীতে প্রবাহিত হইবে সে এরূপ একবার বলিবেই বলিবে। বিজয়কৃষ্ণ উহার কারণস্বরূপ পরবর্তীকালে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "উহা সাধনার একটি সাধারণ স্তর—কোন মতবাদ নয়।" কাঁচা ইট রোদে না শুকাইলে আগুণে উহার আকার রক্ষা করা যায় না। ধর্মের দাহিকা শক্তি তদূর্ধ্বে। বিজয়-কৃষ্ণের এই কাঁচা আমির সময় একবার নয় দুইবার অশরীরি বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন, "পরকাল চিন্তা কর"। এবং সেই সময়েই আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন বিজয়কৃষ্ণের পিতার শিষ্যা রংপুর জেলার আমলাগাছির জমিদার গৃহিণী শ্রীমতী জয়তারা চৌধুরাণী "অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া—চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার পদপূজা করিতে-ছিলেন। হঠাৎ বিজয়কৃষ্ণ বিবেকবাণী শুনিতে পাইলেন, "তুমি

তোমার উদ্ধারের পথ জান না—কি করিয়া অপরের উদ্ধার সাধন করিবে ?'' একটি অশরীরি বাণী ও অপরটি বিবেকবাণী এই দুই এর তীব্র কশাঘাতে বিজয়কৃষ্ণের কাঁচা আমিকে পাকা আমিতে পরিণত করিয়াছে তিলে তিলে তাহার প্রত্যেক চিন্তায় ও কর্মে। যা'হক বিজয়কৃষ্ণ ঐ দিন হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন তিনি আর সত্যের অপলাপ করিবেন না অসত্যকে সত্যের বেশে সজ্জিত করিয়া।

এই ঘটনার কিছু সময় পরে বিজয়কৃষ্ণ বগুড়া জেলার সাতশিমলা নাড়ীপাড়া নিবাসী শিষ্য হারাধন নন্দীর বাটীতে গমন করেন। তথায় কিশোরীনাথ রায়, হারাধন বর্মণ ও গোপেন্দ্রচন্দ্র পাড়ে নামে তিনজন সাধু প্রকৃতির ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইঁহাদের সরলতা, বিনয় ও অন্যান্য চরিত্র মাধুর্যে তাঁহাদের সহিত বিজয়কৃষ্ণ বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন তাঁহাদের চরিত্র মাধুর্য সত্বেও তাঁহারা বিজয়কৃষ্ণের ধর্মমতের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই—তিনি যে বৈদান্তিক ছিলেন সেই বৈদান্তিকই রহিয়া গেলেন।

এই সময়টি বাংলার হিন্দুদের ছিল একটি বিষম দুর্দ্দিন। তখন সুরাপান, মাংস, উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ সভ্যতার একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন বিজয়কৃষ্ণকে নানা প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়াছিল কেবল মাত্র তাঁহার বংশমর্যাদা বোধ। এই বংশ গৌরব বোধ হেতু তিনি তাঁহার তৎকালীন আশ্রয়দাতারও অসৎ আচরণের প্রতিবাদ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। খোদ সংস্কৃত কলেজ ছিল তখন নাস্তিকতার একটি সুরক্ষিত কেন্দ্র। সে দুর্দ্দিনে ব্রাহ্ম সমাজ যে বাংলা তথা ভারতের এক আদর্শ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল উহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বিজয়কৃষ্ণ বগুড়ার ব্রাহ্মত্রয়ের বন্ধুতা সূত্রে একদিন জোড়াসাঁকো আদি ব্রাহ্মসমাজে গিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের "পাপীর দুর্দ্দশা ও ঈশ্বরের করুণা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। ঐ দিন হইতে তাঁহার পূর্বের ভক্তিভাব আবার জাগিয়া উঠিল—যে বিজয়কৃষ্ণ

বলিয়াছিলেন "আমি উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করি না" সেই বিজয়কৃষ্ণ উপাসনায় ব্রতী হইলেন—বলিলেন, "হে ঈশ্বর, হে প্রভু আমার! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম—আমি তোমার দ্বারে পড়িয়া রহিলাম—রাখ বা না রাখ সে ইচ্ছা তোমার।" সংস্কৃত কলেজে থাকা কালে বিজয়কৃষ্ণ ও তৎসহিত তাঁহার সহপাঠি ও অকৃত্রিম বন্ধু অঘোরনাথ, শিবনাথ, উমেশ দত্ত ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে অন্যান্য ছাত্রগণ "ভাগবত" বলিয়া উপহাস করিত। বস্তুতঃ বিজয়কৃষ্ণ এই সময় হইতে ভাগবত ধর্ম্ম প্রচারের সাহস ও উদ্যম সংগ্রহ করিলেন। হিন্দুয়ানীর যে প্রাণহীন অনুষ্ঠান ছিল লৌহ বন্ধন, উহা ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্ম সমাজের এ অবদানের কথা বিজয়কৃষ্ণ কখনও অস্বীকার করেন নাই। তিনি পরবর্ত্তী জীবনে একদিন মহর্ষিকে বলিয়াছিলেন, "আপনিই তো আমার গুরু।" তদুত্তরে মহর্ষি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "হাঁ, তা ঠিকই বলেছ, গুরুত বটেই। তবে সে যে পাঠশালার ছেলের গুরুমহাশয়ের মত। পরে ঐ ছেলেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিয়া ঐ গুরুমহাশয়ের গুরুর উপযুক্ত হয়।"

মেডিক্যাল কলেজ

চতুর্দ্দিকে ছড়ান বরফগলা জল অবশেষে একটি খাদ ধরিয়া চলিতে থাকে। বংশ পরম্পরায় গুরুগিরি ছিল বিজয়কৃষ্ণের একমাত্র জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। ইহাতে অবস্থা বিশেষে কৃত্রিম আচরণের লইতে হয় বলিয়া বিজয়কৃষ্ণ সেদিক হইতে হাত গুটাইয়া বসিয়াছিলেন। এই সময় শান্তিপুরে এক দরিদ্র রোগীর প্রতি এক চিকিৎসকের নিষ্ঠুর আচরণ দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণের সবুজ কোমল চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। এ অবস্থায় বিজয়কৃষ্ণ এমন একটি পথ বাছিয়া নেওয়ার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন যাহাতে জীবিকা উপার্জ্জন ও আর্ত্তের সেবা পরস্পর স্বার্থ সংঘাত না ঘটাইয়া চলিতে পারে। বিজয়কৃষ্ণ সংস্কৃত কলেজ

ছাড়িয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বাংলা বিভাগে ভর্ত্তি হইলেন। এই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন—সে ছিল ১৮৬০ কি ১৮৬১ খ্রীঃ। দীক্ষাকালীন উপদেশের মধ্যে দুইটি উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়—দিবা নিদ্রা ত্যাগ ও অভুক্ত অবস্থায় গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে হইবে। এই সময় হইতে বিজয়কৃষ্ণ নিয়মিত আসনে বসিতে অভ্যাস করেন। (বিজয়কৃষ্ণ জীবনের শেষ চতুর্দ্দশ বৎসর একেবারেই নিদ্রা যান নাই—বলিতেন তাঁকে এক পলকের জন্যও চোখের আড়াল করিতে ইচ্ছা হয় না।) প্রথম হইতেই দেখিতে পাই বিজয়কৃষ্ণ উপবীত ধারণ বিষয়ে মহর্ষির সহিত একমত হইতে পারেন নাই। বিজয়কৃষ্ণ উপবীত ত্যাগ করিলেন ও আহার বিহারে পংক্তি বিচার ছাড়িয়া দিলেন—মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি ভগবানের অবমাননার রূপান্তর এই বুদ্ধিতে।

এদিকে তাঁহার উপবীত ত্যাগ সংবাদ শান্তিপুরে প্রচারিত হইলে স্বর্ণময়ী দেবী অতীব শোকাভিভূত হইয়া পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে মুহূর্ত্ত মধ্যে বাড়ী জন কোলাহলে ভরিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে অবিশ্রান্ত উপদেশ ধারা তাহাতে বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু উহাতে জননীর শোকমাত্রা কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। দৈবযোগে এই সময় বাটীতে এক গৈরিকধারী শান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়া জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা তুই কাদিস কেন? তোর পুত্র সামান্য ব্যক্তি নয়, তাহার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিস না। তোর এই পুত্র দ্বারা দেশের মহোপকার সাধিত হইবে এবং মহৎ বংশের মুখ হইবে সমুজ্জ্বল। (মনেহয়, এটিও শ্যামসুন্দরেরই একটি লীলাচাতুরী।

সোমপ্রকাশের সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বিজয়কৃষ্ণের উপবীত ত্যাগ বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছিলেন,

"ধর্মার্থে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের কোন কঠিন কার্য্য অসাধ্য ছিলনা।"

মেডিক্যাল কলেজের কোর্স সমাপ্ত করিয়াও যে কারণে তিনি কলেজ বর্জ্জন করিলেন সে কারণটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ—আত্মমর্য্যাদাসীন জাতির এক গৌরব কাহিনী। বোধহয় বিজয়কৃষ্ণই অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পথ প্রদর্শক।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ

বিজয়কৃষ্ণের জীবনযাত্রার পরবর্ত্তী পান্থনিবাস ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ। বিজয়কৃষ্ণের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন—বিজয়কৃষ্ণ একদিন শুনিতে পাইলেন যশোহর জেলার বাগআঁচড়া গ্রামে কতিপয় লোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে একান্ত উৎসুক কিন্তু ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ সেখানে পাঠাইবার জন্য কোন লোক পাইতেছেন না। এ অবস্থায় বিজয়কৃষ্ণের প্রাণ ধর্মপিপাসুদের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া তিনি তথায় যাইবার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ধর্মের কয়টি পা আমার জানা নাই—তবে দুইটিত নিশ্চয়ই; কেননা উন্নত জীব সকল দ্বিপদী—একটি ভক্তি অপরটি দয়া। ভক্তিটি বিজয়কৃষ্ণের পৈত্রিক সম্পত্তি। নবদ্বীপের সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী বিজয়কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "ভক্তির ভাণ্ডারী হইয়া তুমি আমার মত জীবাধর্মের নিকট ভক্তিলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি তোমার ললাটে তিলক, মস্তকে জটাভার ও গলদেশে তুলসীর মালা সন্দর্শন করিতেছি"। আর দয়াটি তাঁহার মাতার সম্পত্তি। বিজয়কৃষ্ণ এই দয়া ধর্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "পরের দুঃখ দূর করাই যদি ধর্ম হয় তবে পাপজীবন হইতে মুক্তকরার চেষ্টা সকলের চাইতে বড় ধর্ম।"

যা'হক বিজয়কৃষ্ণ দয়াপরবশ হইয়াই যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ইহা অতীব সত্য। তবু তাহার পশ্চাতে ছিল একখানি অব্যক্ত হস্ত যাহার প্রেরণায় তিনি সকল কার্য্যে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতেন। এই অব্যক্ত হস্তখানির সম্বন্ধে তিনি যাহা পূর্বাপর ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আমি পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

"আমি ব্রাহ্মধর্মের একজন অধম প্রচারক। আমি নামের গৌরবের জন্য প্রচার ব্রত গ্রহণ করি নাই। আমার আত্মার গভীর স্থানে কি একটি আশ্চর্য্য শক্তি আছে। এ শক্তি আমার নহে। ইহা আমার যত্ন সাপেক্ষও নহে; ইহাতে আমার কোন প্রভুত্ব নাই। আমার ইচ্ছার সঙ্গে ও ইহার সঙ্গে প্রায় কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। এই শক্তি আমাকে অন্ধের ন্যায় পরিচালনা করে; এবং ভবিষ্যতে কোথায় পরিচালনা করিবে বলিতে পারি না। ইহা আমার প্রবৃত্তিকে জগতের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে আদেশ করে। ইহার আদেশ এরূপ পরিস্কার ও বোধগম্য যে, আমি কখনও উহা বিস্মৃত হইতে বা অগ্রাহ্য করিতে পারি না।"

"ইহা আমাকে প্রচারক নাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। আমি সর্ব্বদা মনকে বুঝাইয়া বলি—হৃদয়, তুমি কি জানিতেছ না যে তুমি অত্যন্ত মলিন ও অধম। তুমি কোন সাহসে প্রচার কার্য্যের গুরুভার বহন আপনার মস্তকে লইতে সাহসী হইলে? কিন্তু পরক্ষণেই উপরিলিখিত শক্তিতে আমার অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং বলে—তুমি অগ্রসর হও। আমার বিশ্বাস এই শক্তির আদেশ ঈশ্বর বাক্য, ইহা প্রচারকের জীবন। ইহাই ভয় বিপদের সম্বল, নিরাশার ঔষধ, প্রার্থনার ইন্ধন। ইহা ব্যতীত আমি অন্ধ অপেক্ষাও অসমর্থ হইয়া যাই, মুমূর্ষু অপেক্ষাও নির্জ্জীব মনে করি।"

"আমি সততই এই শক্তির আদেশ গ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করি। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, তাহা প্রতিপালন করি। তখন আমার আত্মাতে আলো আসে। আমি যাহা বলি লোকে তাহাতে

আকৃষ্ট হয়। আমি যাহা বলি বা করি তাহাতে আমার অনুমাত্র গৌরব নাই। কারণ আমি নিঃসন্দেহে জানিতে পারি যে ইহা আমার শক্তি হইতে নহে। কার্য্যের সময় আপনার উপর নির্ভর করিতে হইবে, ইহা মনে হইলে—যথার্থ বলিতেছি—আমার শরীর কম্পিত হইতে থাকে। আমি নিশ্চয়ই জানিতেছি যে আমাদ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্ভবে না এবং কোন কার্য্যের গৌরবে আমার অধিকার নাই। পাপ-পুণ্যে, সুখে-অসুখে, সম্পদে দারিদ্রে আমি এই অদ্ভুত শক্তির আদেশ শুনিতে পাই। নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ দেখিয়া হৃদয় যখন উচ্চ ও প্রসন্ত হয়, তখন ইহা আমাকে বলে, "তুমি এমন সুন্দর জগতের একস্থানে বসিয়া কি করিবে"। যখন সুমন্দ সুমিষ্টি মারুত আমার সমস্ত শরীর সুশীতল করে তখন ইহা বলে, "তুমি কি সুখে গৃহে বসিয়া আছ? এই অনিল হিল্লোল কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, ভাবিয়া দেখ এবং তুমিও সেইরূপ চতুর্দ্দিক ধাবিত হও। ইহার রমণীয়তা দেশ বা কাল ভেদে অসমান নহে; তোমার অনুরাগ ও চেষ্টা তদ্রূপ মধুবাহিনী হইবে —অগ্রসর হও।' অমনি আমার শরীর মন ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং যেখানে তাহার কার্য্য সেইখানে যাইতে ব্যস্ত হয়। "অগ্রসর হও" এই প্রকার উক্তির আদেশ শুনিলে যেমন ভয়ে দুঃখে হৃৎকম্প হয় তেমন বিশ্বাস, বিস্ময়ে অন্তর পরিপূর্ণ হয়; আমি ঐ আদেশ শুনিয়া কোন ক্রমেই ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইহা আমার গৌরব নহে— আমার মনের কথা এবং কেনই যে লোকের একথা বিশ্বাসযোগ্য হইবে না তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমার সকল অবস্থাতেই আমি ইহার বশবর্ত্তী হইয়াছি এবং সকল অবস্থাতেই হইব। ইহার বশবর্ত্তী হইয়া আমি সকল সময় আশার অতীত ফল পাইয়াছি। অবিশ্বাস, অহংকার ও নৈরাশ্য ইহার জন্য আমাকে গতানুসু করিতে পারে না। এই জ্যোতির্ময় অখণ্ড শক্তির ইঙ্গিতে যে তীর্থস্থানে গমন করিবার আমার আশা জাগে, সেখানকার কথা শুনিলে আমার নয়ন বারি বিগলিত হয় এবং সেখানে যাইবার জন্য সততই দুর্বল চরণ ব্যস্ত হয়, পরিণামে

নির্ব্বিঘ্নে সেই প্রাণসম তীর্থে উপনীত হইতে পারিব ইহাই আমার বিশ্বাস। পরমেশ্বর আমাকে আশীর্ব্বাদ করুণ। কি কারণে আমি প্রচারক হইয়াছি এবং কেনই যে আমি অদ্যাবধি প্রচারক নাম ধারণ করিয়া আছি তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে বিজয়কৃষ্ণ কি বুঝিতেন

যাহা সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। সর্ব্ব দেশে ও কালে, সকল জাতির মধ্যে ব্রহ্মধর্ম্মের অধিকার। স্বভাবতঃই এই ধর্ম্ম উদার, পবিত্র এবং মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। উপাসনাই ব্রাহ্মের প্রাণ ইহা তাঁহার পরীক্ষিত সত্য। ব্রহ্মপূজা পুস্তকে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে ব্রহ্মপূজা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

হর পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বাত্মা বিশ্বপতি পরমেশ্বর প্রীত হন কারণ জগৎ তাঁহার আশ্রিত। তিনি এক, সৎস্বরূপ, সত্য, অদ্বৈত, পরাৎপর, স্বপ্রকাশ, সদাপূর্ণ, সচ্চিদানন্দ ও নির্বিকার। সেই সৎস্বরূপ ঈশ্বরের সত্তা আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক পদার্থ পৃথক পৃথক সত্যরূপে প্রকাশিত হইতেছে। হে দেবি! তাহা হইতে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি—সেই একমাত্র পরমেশ্বর সর্বভূতের কারণ। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, এজন্য ত্রিলোকে তিনি স্রষ্টা ও ব্রহ্ম বলিয়া গীত হইয়া থাকেন। যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, মেঘ বারিবর্ষণ করে, তরু সকল পুষ্পিত হয়, যিনি কালে কালকে নিয়মিত করেন, যিনি মৃত্যুর মৃত্যু, ভয়ের ভয় এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য, সমস্ত জগত তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তিনি তুষ্ট হইলে জগৎ তুষ্ট, তিনি প্রীত হইলে জগৎ প্রীত। তাহার আরাধনাতে সকলে প্রীত হয়। মূলে জল সেচন করিলে যেমন সকল শাখা প্রশাখা পল্লবিত হয়, তদ্রূপ তাহার পূজাতে সকলেই প্রীত ও তুষ্ট হইয়া থাকে। সেই ধ্যেয়, পূজ্য সুখারাধ্য পরমেশ্বরের পূজা ভিন্ন মুক্তিলাভের উপায় নাই। যাঁহার সাধনে কোন

ভ্রম নাই, শারীরিক ক্লেশ নাই, আচারাদি নিয়মের প্রয়োজন নাই এবং দিক কাল, মুদ্রান্যাসের বিধি নাই, কোন ব্যক্তি না তাঁহার আশ্রয় করিবে? সেই ধন্য, কৃতার্থ, কৃতী ধার্মিক যাহার কাণে ওঁকার মন্ত্র প্রবেশ করিয়াছে।

অদ্বৈত আরাধনার ধন মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম॥

বিজয়কৃষ্ণ, অদ্বৈতের দশমপুরুষ, সর্ব্বতোভাবে উহারই সাধন করিয়াছেন ও তিনি সে ব্রহ্মধর্ম্ম হইতে কখন তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই।

ভক্তি ধর্ম্মের সূচনা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পাহাড়ের বরফগলা জল একটি খাত ধরিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল কিন্তু বরফগলা সকল জলই যে একটি খাত ধরিয়া প্রবাহিত হইবে উহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ক্ষীণ ধারাগুলি একের সহিত অন্যটি মিলিত হইয়া এক স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করে—ইহাই সাধারণ নিয়ম নতুবা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করা তাহার পক্ষে দুষ্কর হইত। (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর কথা—সকল ঘাট না ঘাঁটিলে ধর্ম্ম সাধন পূর্ণ হয় না।)

১৮৬৭ খ্রীঃ-এ যখন ভারতীয় ব্রহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সমাজের দলপতি হলেন কেশবচন্দ্র এবং তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কাজ করিতে লাগিলেন বিজয়কৃষ্ণ। এই সময় হইতে পূর্ব বঙ্গে প্রচারের ভার ন্যাস্ত হইল বিজয়কৃষ্ণের উপর। সামাজিক অনুষ্ঠান বিষয়ে মতদ্বৈত হওয়ায় ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি। কিন্তু এখানেও নানা কারণে মতদ্বৈত দেখা দিল। এই অশান্ত পরিবেশ দেখিয়া অশান্ত মন নিয়া বিজয়কৃষ্ণ কিছু দিনের জন্য শান্তিপুরে চলিয়া যান। ভগবত

ইচ্ছায় তিনি তথায় পরম বৈষ্ণব হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হন। বিজয়কৃষ্ণ প্রামাণিক মহাশয়কে আপনার অশান্তির কারণ অকপটে খুলিয়া বলিলেন। প্রামাণিক মহাশয় বিজয়কৃষ্ণকে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিতে উপদেশ দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিনয়, ভক্তি, অনুরাগ, ব্যাকুলতা, ঈশ্বর দর্শন ও সম্ভোগ বিষয় পাঠ করিয়া বিজয়কৃষ্ণের চিত্ত বিমোহিত হইল।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কামায়।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তির হৈতুকী ত্বয়ি॥

এই শ্লোকটি বিজয়কৃষ্ণকে দিল এক নূতন আলোর সন্ধান—ভক্তি ভগবানের এক অহৈতুকী কৃপা—কেবল আচার অনুষ্ঠান মূলক সাধন দ্বারা উহা লাভ হয় না। চৈতন্যদাস বাবাজীও উপদেশ দিয়াছিলেন, "যদি প্রেমভক্তি লাভ করিতে চাও তবে দীন, হীন অকিঞ্চন হও। অন্তরে এক বিন্দু অহংঙ্কার থাকিলেও ভক্তিলাভ হইবে না।" প্রেমিক মহানুভব বাবাজীর সে উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ বিজয়কৃষ্ণ মাথা পাতিয়া নিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতে আসনে বসায় অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। এবার নির্জ্জনে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। ব্রহ্ম সমাজে থাকা কালীন বিজয়কৃষ্ণের ধ্যান গভীরতার একটি পরিষ্কার চিত্র আমরা দেখিতে পাই নিম্নোক্ত ঘটনাটির ভিতর।

মৈমনসিংহ জেলার কোথাও এক সময় প্রার্থনা মণ্ডপে ব্রহ্মসমাজ বিরোধী কতিপয় ব্যক্তি গুণ্ডার সাহায্যে একদিন নানা প্রকার উৎপাতের সৃষ্টি করে। গুণ্ডারা চেয়ার টেবিল ভাঙ্গিয়া চূরমার করিতে লাগিল। প্রার্থনারত ব্যক্তি সকল ভয়ে পলায়ণপর হইলেন। প্রার্থনা বেদীতে উপবিষ্ট বিজয়কৃষ্ণ ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। একটি গুণ্ডা গিয়া তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কাণমলা দিয়া তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিতে অসমর্থ হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, "ওরে ভাই; এ ঘটে দেবতা আছে।"

কলিকাতায় যখন সমবেত প্রার্থনার সাথে কতিপয় ধর্মপিপাসু সাধক নির্জ্জনে ধ্যান অভ্যাস করিতেছিলেন সেই সময় ঘটনাচক্রে বিজয়কৃষ্ণের অগ্রজ ব্রজগোপাল গোস্বামী কলিকাতা আসিয়া সহোদরকে একটি গান শুনাইলেন।

কানু পরশমণি আমার।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ
নয়নের পরশমণি—বিজয়কৃষ্ণের সেরূপ দরশন ইত্যাদি

সে পরশমণি বিজয়কৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয় মথিত করিয়া মরমে প্রবেশ করিলেন এবং বিজয়কৃষ্ণের সাথে সাথে অলক্ষিতে সমাজগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন, খোল করতাল সংযোগে কীর্তন আরম্ভ হইল প্রার্থনা মন্দিরে। কানু পরশমণি কীর্তনের পথেই যেমন আসিয়াছিলেন সেই পথেই তেমন বিজয়কৃষ্ণের হাত ধরিয়া সমাজগৃহ হইতে বাহির করিয়া নিয়া গেলেন সর্ব সমক্ষে—কাহার বাধা দেওয়ার শক্তি হইল না।

প্রচার কার্য্য ও তাহার সাফল্য

১৮৬৪ খ্রীঃ হইতে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ব্রতী হন এবং ১৮৮৬ খ্রীঃ এ এক পত্রদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করেন। এই দীর্ঘ ২২ বৎসরের পূর্ণ কার্য্য বিবরণী এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হওয়া অসম্ভব এবং উহা আমার উদ্দেশ্যও নহে। সহস্র বাধা বিপত্তি মাথায় নিয়া, শারীরিক, আর্থিক ও সামাজিক নিগ্রহ উপেক্ষা করিয়া প্রচার কার্য্যে কিরূপ ভাবে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন উহার কয়েকটি ঘটনা আমি এখানে উল্লেখ করিতেছি। আশাকরি ব্রাহ্মসমাজে বিজয়কৃষ্ণের অবদান বিষয়ে ঐ দুই চারিটি ঘটনাই যথেষ্ট।

বিজয়কৃষ্ণের কর্মস্থল ছিল বাংলা, বিহার, আসাম ও উত্তর প্রদেশ ব্যাপিয়া। বাংলাতে একটি কথা আছে "আপ খোরাকী বিনে মাইনা।" বিজয়কৃষ্ণের মাহিনা কেন খোরাকীও ছিলনা। অপর পক্ষে তাঁহার প্রাপ্য ছিল নিন্দা, পীড়ন উপবাস বহুবিধ লাঞ্ছনা।

বিজয়কৃষ্ণ প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলে দেবেন্দ্রনাথ প্রচারকের বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু পবিত্র প্রচার ব্রতের সহিত অর্থের সম্বন্ধ রাখা বিজয়কৃষ্ণের অভিপ্রেত নয় বলিয়া উহা স্থগিত হয়। বাগ-আঁচড়া বিজয়কৃষ্ণের প্রথম কর্মস্থল কিন্তু তত্রত্য জলবায়ু বিজয়কৃষ্ণের মোটেই সহ্য হইতে ছিলনা। তৎসত্ত্বে ও তিনি তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের স্বল্পমাত্রাও কখন হ্রাস করেন নাই বা বিন্দুমাত্রও ঔদাসিন্য দেখান নাই —প্রাতঃকালে চিকিৎসা, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে শিক্ষকতা, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে উপদেশ প্রদান ও শনিবার ব্রহ্ম-সমাজের উপাসনা এই ছিল তাঁহার তখনকার সাধারণ কার্য্যক্রম। এ সকল কার্য্য তিনি ঘড়ির কাটা ধরিয়া করিতেন শরীরের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া। এস্থানেই তাহার প্রথম স্বাস্থ্য অবনতি ঘটে যাহার জন্য পরে মরফিয়া সেবন করিতে হইত।

১৮৬৪ খ্রীঃ-র ২০শে আশ্বিন প্রবল ঝড়ে কলিকাতা শহর বিধ্বস্ত হইয়া গেল। শহরের পথ জলপ্লাবিত, কোথাও উন্মূলীত বৃক্ষাদিতে অবরুদ্ধ, চতুর্দ্দিকে ভয়ার্ত্ত নরনারীর করুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। সেদিন ছিল বুধবার—আদি ব্রহ্মসমাজের উপাসনার দিন। বিজয়কৃষ্ণ পথ সাঁতরাইয়া সমাজগৃহে আসিয়া দ্বারবান ডাকিয়া সমাজগৃহের দরজা খুলিলেন ও উপাসনা করিয়া চলিয়া গেলেন। সে দুর্যোগে বিজয়কৃষ্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ব্যাক্তি উপাসনা গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। কেশব সেন অবশ্য পরে আসিয়াছিলেন তবে পাল্কীতে, পথের জল কিছু হ্রাস পাওয়ার পর।

কেশবচন্দ্র যখন তাহার বন্ধুবর্গ সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে চলিয়া আসেন, তখন বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার পরিবার ও কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধু সহ রাধানাথ মল্লিক লেনের এক ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করিতেন

ঐ বাড়ীটি ছিল নব্যদলের একটি মিলন কেন্দ্র—অতিথি অভ্যাগত লাগিয়াই থাকিত সেখানে। তখন বিজয়কৃষ্ণের আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় ছিল যে পরিবার সহিত তাঁহার মাঝে মাঝে অনাহারে দিন কাটাইতে হইত—ভাত জুটিলেও ব্যঞ্জন জুটিত না—নুন বাদে কাঁচা তেতুল সিদ্ধ করিয়া ব্যঞ্জনের অভাব পূরণ করিতেন। কখন বা হলুদ গুঁড়া দিয়া খিচুড়ি অল্প তৈয়ারী করিয়া নিতেন। তরকারির ভিতর ছিল গৃহ প্রাঙ্গনের দোপাটি ফুল ভাজা বা নটে শাক সিদ্ধ।

১৮৬৮ খ্রীঃ-এ বিজয়কৃষ্ণ মৈমনসিংহের ব্রাহ্ম মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ঐ সময় একদা প্রচার উপলক্ষে সেরপুর যাইবার পথে কাশবনে এক প্রকাণ্ড বন্য মহিষ কর্তৃক তিনি আক্রান্ত হন। সৌভাগ্য বশতঃ কতিপয় কুম্ভকার সেখান হইতে মাটি খুঁড়িয়া লওয়ায় একটি গর্ত্ত হইয়াছিল। হাওয়াতে কেশবন আন্দোলিত হওয়ায় বিজয়কৃষ্ণ ঐ গর্তটি দেখিতে পাইয়া তাহাতে আশ্রয় নিলেন। হাওয়াতেই আবার কেশবনে গর্ত্তটি ঢাকা পড়িয়া গেল। ক্রুদ্ধ দানব শিকার দেখিতে না পাইয়া খুর ও শিং দ্বারা সে স্থানটি চষিয়া ফেলিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

প্রচার কার্য্যে বিজয়কৃষ্ণ একবার ষ্টীমার যোগে আসাম অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতে যান। ষ্টীমারের ভাড়া ব্যতীত তাঁহার একটি পয়সাও সম্বল ছিল না যাহা দ্বারা পথে কিছু আহার করিতে পারেন। ঐ ষ্টীমারে কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকও সপরিবারে আসামে কর্মস্থলে যাইতেছিলেন। ধর্মালাপের মাধ্যমে বিজয়কৃষ্ণের সহিত তাহাদের আলাপ পরিচয় ও সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল কিন্তু দুই তিন দিবসের ভিতর বিজয়কৃষ্ণের অন্য কোন সংবাদ রাখার সুযোগ তাহারা পান নাই। বিজয়কৃষ্ণ ঐ কয়টি দিনই ছিলেন অভুক্ত। দুই তিন দিবস অন্তে ষ্টীমার একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাইয়া নোঙ্গর করিয়া তীরে উঠিবার জন্য সিঁড়ি ফেলিল। বিজয়কৃষ্ণ তখন তীরে উঠিয়া নদী কিনারার পলিমাটি লইয়া দুই অঞ্জলিতে জল মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বারাই তিনদিবসের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া ষ্টীমারে উঠিলেন। জাহাজের

পরিচিত ভদ্রমহোদয়গণ উহা দেখিতে পাইয়া বিজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তীরে উঠিয়া কি করিতেছিলেন?" বিজয়কৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "ভগবান অদ্য আমার জন্য যে আহারের ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন উহাই আমি গ্রহণ করিলাম।"

এখন শুনুন বিজয়কৃষ্ণের লাঞ্ছনার কাহিনী। প্রচারে বাহির হইয়া একদিন এক শীতের রাতে তিনি এক গয়লার বাড়ী আশ্রয় নেন। গয়লা শান্তিপুরের গোঁসাই মনে করিয়া তাঁহাকে পরমাদরে গ্রহণ ও আহারাদির ব্যবস্থা করিল। বিজয়কৃষ্ণ মনে বিচার করিলেন গয়লা তাঁহাকে এতাদৃশ আদর যত্ন করিতেছে শুধু শান্তিপুরের গোঁসাই মনে করিয়া কিন্তু তাঁহার অপর পরিচয় তাহার নিকট অজ্ঞাত, অতএব সত্যের অপলাপ হইতেছে। বিজয়কৃষ্ণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তখন তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক পরিচয়টি প্রকাশ করিলেন। গয়লা ও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বিজয়কৃষ্ণকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। বিজয়কৃষ্ণ মনের আনন্দে সারারাত কাটাইয়া দিলেন শীতের উন্মুক্ত গগণতলে ভগবানের গুণগান করিতে করিতে।

অন্যের কথা আর কি বলিব! যে বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের মাটিতে বড় হইয়াছিলেন, যে শান্তিপুরের অলিগলি তাঁহার শৈশবের লীলাভূমি ছিল, যে শান্তিপুরের নর-নারীর সুখ দুঃখের তিনি ছিলেন অংশভাগী, সেই শান্তিপুরের লোকেরাই বিজয়কৃষ্ণ পথে বাহির হইলে তাঁহার গাত্রে কাদা, গোবর, নর্দমার ময়লা জল নিক্ষেপ করিতে। তাহারা তাঁহাকে সমাজের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া বিজয়কৃষ্ণের অগ্রজ ব্রজগোপাল গোস্বামীকে বাধ্য করিয়াছিলেন দুই ভাই-এর বাড়ীর ভিতর এক উচ্চ প্রাচীর উত্তোলন করিতে। শান্তিপুরের গোঁসাইদের গোঁড়ামীর দৌরাত্ম্য এত প্রবল হইয়াছিল যে তাহারা বিজয়কৃষ্ণের জীবিকা নির্বাহের পথে বাধা দিতেও ক্ষান্ত হন নাই। কাহার বাড়ী রোগী মরিয়া গেলেও তাহাদের গৃহ চিকিৎসক বিজয়কৃষ্ণকে ডাকিতে দিতেন না।

কিন্তু এতদ্ সত্ত্বেও বিজয়কৃষ্ণের সাধনার অগ্রগতি কেহ কখনও রোধ করিতে পারে নাই। তাঁহার লক্ষ্য ছিল—সুবিমলমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রাহ্মমন্দিরম্। তাঁহার প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে গড়িয়া উঠিয়াছিল এক সুশোভন ব্রাহ্মমন্দির যাহার ছায়া তলে আজও শতশত নরনারী আশ্রয় পাইয়া আসিতেছে।

বিজয়কৃষ্ণের প্রচারের অবিসংবাদীয় সাফল্য বিষয়ে তাঁহার সতীর্থ-গণ যে মত পোষণ করিতেন তাহারই দুই চারিটি কথা এখন সংক্ষেপে আমি পাঠকবর্গকে পরিবেশন করিতেছি।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—ঐরূপ সরল অন্তরে সমুদায় হৃদয় মন প্রাণের সহিত কাহাকেও ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এমন ভক্তি ও বিনয় অতি অল্পই দেখিয়াছি। এই কারণে তিনি আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু হইয়াও আমার গুরুস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহার ভক্তি ও বিনয় যদি পাই, তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া যাই। তিনি তাঁহার পবিত্র জীবনে ব্রাহ্মসমাজকে ভক্তিপথ যাহা দেখাইয়াছেন সে জন্য ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে।

শাস্ত্রী মহাশয় অন্য সময়ে বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মের মৌখিক প্রচার আর কি করিব? গোঁসাইজীকে একখানা আসনে বসাইয়া দ্বারে দ্বারে দেখাইলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার করা হয়। যেখানে গোঁসাই সেখানেই উৎসব; যে গৃহে তিনি, সে গৃহই সরস। কি শহর কি মফঃস্বল, সকল স্থানের নরনারীর আকর্ষণ তাঁহার প্রতি ছিল।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় বলিয়াছেন —গোস্বামী মহাশয়ে ব্যাকুলতা, নিষ্ঠা, বিনয়, ধর্ম্ম সাধনে অনুরাগ ও ভক্তিলাভের জন্য আগ্রহ এত অধিক ছিল যে ঐরূপ প্রায় দেখা যায় না। তিনি যখনই কোন সাধকের সাক্ষাৎ লাভ করিতেন, তখনই তাহার পদধূলি নিয়া দীনতার পরিচয় দিতেন। আমরা এক পুষ্পবৃক্ষ তলে বসিয়া উপাসনা করিতাম। একদিন ধ্যানের সময় হঠাৎ চক্ষু

মেলিয়া আমি দেখি তিনি কাঁদিয়া অধীর হইয়াছেন এবং ক্রমাগত মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছেন। তাঁহার তৎকালীন কাতরতা দর্শনে আমার মনে হইয়াছিল, ইনি যথার্থ ধার্ম্মিক।"

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন—ধর্ম্মের জন্য ক্ষ্যাপা হইয়াছেন অধুনা আমি এরূপ লোক ব্রাহ্মসমাজে দেখিতেছি না। একটি লোক দেখিয়াছিলাম—তিনি সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। আমি তাহার ন্যায় ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলাত্মা দেখি নাই।

১৮৮২ খ্রীঃ-র তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল—

সকলের চেষ্টায় ঠিক উপযুক্ত সময় বিজয়কৃষ্ণ গয়াতে আহূত হইলেন। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় বিষ্ণুপুরাণ, ভগবদ্গীতা, ভাগবত, উপনিষৎ, আত্মপুরাণ, মহানির্বাণ তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক সত্য সকল ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। দুই এক দিন শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়া যাঁহারা কখনও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না তাঁহারাও গোস্বামী মহাশয়কে সবান্ধবে আহ্বান করিয়া নিজ বাড়ীতে শাস্ত্রপাঠ ও সংকীর্তনাদি সপরিবারে শুনিতে লাগিলেন—ইত্যাদি। হিন্দুশাস্ত্রের ভিতর ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইলেন, কাহারও কাহারও ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতিও অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

দীক্ষার পথে

বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমি পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম। এখানে আসিয়া উপাসনা, প্রার্থনা ধ্যানধারণাদি অনেক শিখিলাম—সত্য সত্য এক নূতন জীবন লাভ করিলাম কিন্তু আমার প্রাণের পিপাসা তাহাতেও মিটিল না। সর্বোত্তভাবে নিরবচ্ছিন্ন তাঁহাকে পাওয়া গেল না—পাওয়া গেল না সে নিরাপদ ভূমি।"

এখন দেখা যাক্ এই অবস্থায় বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার সমগ্র জীবনে যে অদৃশ্য হস্তদ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছিলেন সে হস্তখানি কোন দিকে অঙ্গুলি হেলন করিলেন। এ সম্পর্কে আমি বিজয়কৃষ্ণের জীবনের তিনটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে এক মাঘোৎসবের সময় উপাসনা কালে আমরা বিজয়কৃষ্ণকে দেখিয়াছি—উপাসনা বেদীতে মা, মা বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি আপনাদের সহিত সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে পারিব না,—অসত্য হইতে সত্যে নিয়া যাও এই কথা বলিয়া; কেননা তিনি যে ইতিপূর্বেই আমাকে সত্যে নিয়া গিয়াছেন।" কোন এক বিরাট জলাশয়ের তীরে দাঁড়াইয়া মানুষ যেমন এক অদৃশ্য বিরাট শক্তি অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠে ঐ দিন বিজয়কৃষ্ণের প্রাণবন্ত উপাসনায় ও তাহার মর্মবাণী শ্রবণে সমবেত ভক্তমণ্ডলী তদ্রূপ এক ঐশীশক্তির আবির্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন। আনন্দ চন্দ্র নন্দী মহাশয় বিজয়কে মাতৃক্রোড়স্থ শিশু বোধ করিয়া দুগ্ধ ও বাটির জন্য পাঁচটি টাকা দিয়াছিলেন। বায়ুচাপ বন্ধ হয়, জল জমিয়া আকার ধারণ করে, তরল গুড়ে দানা বাঁধিয়া মিছরি হয়—এই রূপান্তর সাধনের ক্রম। যে ঐশীশক্তি সন্দর্শনে বিজয়কৃষ্ণ মা, মা বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন সে ঐশীশক্তি আর একদিন তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন সৈদপুর উত্তরপাড়া ব্রাহ্ম-সমাজে উপাসনার সময় মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু রূপে। উপাসনার সময় অনিমেষ নেত্রে যেন কাহাকে তিনি দেখিতেছিলেন। উপাসনা শেষ হইবার পরেও অনেকক্ষণ ধরিয়া ঐ অবস্থায় রহিলেন। পরে বাহ্যজ্ঞান হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কি দেখিতে-ছিলেন? তিনি বলিলেন—মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছিলাম। অসন্দিগ্ধ উত্তর, দ্বার্থের অবকাশহীন —ভগবানের ঘনীভূত সত্ত্বা বিষয়ে লব্ধ সত্য।

বিজয়কৃষ্ণ ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক অবস্থায় একবার কাশী যান ও তথায় তৈলঙ্গ স্বামীর দর্শন লাভ করেন। সে বোধহয় ১৮৭৫

শ্রীঃ-র কথা। নবকুমার বাগচী মহাশয়ের শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ কথামৃত পুস্তকে দেখা যায় স্বামীজী বিজয়কৃষ্ণকে গঙ্গায় একটি ডুব দিয়া আসার জন্য ইঙ্গিত করেন। "আমি ক্লান্ত, পারিব না" বলিয়া বিজয়কৃষ্ণ অসম্মতি প্রকাশ করেন। স্বামীজী দ্বিতীয়বার ইঙ্গিত করিলে বিজয়-কৃষ্ণ হঠ করিয়া সে আদেশও প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তী চরিতকারগণ এই হঠ শব্দটির যথার্থ মূল্য দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বিজয়কৃষ্ণের সহিত স্বামীজীর পূর্ব ও পরবর্তী ইঙ্গিত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় এই হঠের ভিতর অবাধ্যতা অপেক্ষা আবদারের ভাগ অধিক, নতুবা এই হঠ করার পর স্বামীজী কিছুতেই বলিতেন না, "বাচ্চা সাচ্চা হয়"। শুধু তাই নয়। বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরে স্বামীজী তদ্রূপ বিজয়কৃষ্ণকে ধরিয়া গঙ্গায় একটি চুবনি দিয়া জোর করিয়া তাহাকে তিনটি মন্ত্র দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলেন, "আমি তোমার গুরু নহি, সময়ে তোমার গুরু মিলিবে। এ মন্ত্র তোমাকে গুরু পাওয়ার সাহায্য করিবে।"

বিজয়কৃষ্ণ একদিন মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। রাস্তায় পশ্চিম দেশীয় একটি সাধু দেখিয়া তিনি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধর্মালাপে প্রবৃত্ত হন। উভয়ের ভিতর বাংলাদেশে ব্রাহ্মধর্মের উত্থান, সমাজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে নানা আলোচনা হইল। বহুদিন পরে বাংলায় ধর্মান্দোলনের কথা শুনিয়া সাধুটি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার অবসর মত একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন বিজয়কৃষ্ণ যখন সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে উপদেশ দিতেছিলেন তখন উক্ত সাধুটি তথায় উপস্থিত হইয়া এক কোণে বসিয়া মনযোগের সহিত সে উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। উপাসনা শেষ হওয়ার পর বিজয়কৃষ্ণ যখন সমাজগৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন সাধুটি তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ প্রশ্ন করিলেন, "উপাসনা কেমন হইল?" সাধুটি উত্তর দিলেন, "বড়ী আচ্ছা, সবতো বেদকা বাণী।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, "উহা আমার মুখ হইতে বাহির হইলেও আমার অবস্থা তদ্রূপ নহে" সাধুটি প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, তোম্ গুরু কিয়া?" প্রত্যুত্তরে বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, "না মহারাজ। আমরা গুরুবাদ মানি না।" সাধুটি কালবিলম্ব না করিয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "ও, এইসি ওয়াস্তে সব বিগড় গিয়া।" একটি, ঐ একটি কথা বিজয়কৃষ্ণের হৃদয়ের অন্তস্থল স্পর্শ করিল। গুরুবাদের বিরুদ্ধে তাহার সঞ্চিত সকল মত শিথিল হইয়া পড়িল। ভগবদলাভ উদ্দেশ্যে বিজয়কৃষ্ণ আত্মবিক্রয় করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। তখনই তিনি ঐ মহাত্মার নিকট দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মহাত্মা বলিলেন, "নেহি তোমরা গুরু দোসরা হায়। বখৎ হনেসে মিল যায়গা।"

দীক্ষা প্রাপ্তি ও ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ

আবার সেই হস্ত ও সেই অঙ্গুলি হেলন। বহুদিন পূর্বে বিজয়কৃষ্ণ বাগআঁচড়া থাকিতে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ বিপদসঙ্কুল এক ভীষণ অরণ্যে পথহারা—দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় উপরে একটি আলো দেখিতে পাইলেন—তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল একখানি হস্ত। ঐ হস্তখানি তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিল। বিজয়কৃষ্ণ বিনা বিচারে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিলেন। চলিতেচলিতে এক উত্তাল তরঙ্গাকুল নদী কিনারায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিতে পাইলেন সাইন বোর্ডে লেখা আছে, "বিশ্বাসীর পারের ঘাট।" হস্তখানি নদীর উপর দিয়া চলিতে লাগিল। বিজয়কৃষ্ণ নির্ভয়ে হাটিয়া নদী পার হইলেন। হস্তখানি অতঃপর অন্তর্হিত হইল। বিজয়কৃষ্ণ সম্মুখে দেখিলেন একটি মন্দির—মন্দিরের ভিতর মহাবীর। মহাবীর হাত ইসারা করিয়া পর্বতের শিরদেশে একটি স্থান দেখাইয়া দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ সদগুরু অন্বেষণে তীর্থে তীর্থে

ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে গয়া আসিয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবরদাস বাবাজীর আশ্রমে আশ্রয় নিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে ঐ স্থানটি তাঁহার পূর্ব স্বপ্নদৃষ্ট স্থান। ঐ আশ্রমে একদিন বিজয়কৃষ্ণ ও শশীবাবু (বন্ধু ও শিষ্য) রঘুবরদাস বাবাজীর সহিত ধর্মকথায় নিরত ছিলেন এমন সময় কয়েকটি রাখাল বালক আসিয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ দিল যে পাহাড়ের উপর এক মহাত্মা অবস্থান করিতেছেন। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁহারা পর্বত উপরি আরোহণ করিয়া ঐ মহাত্মার দর্শন পাইলেন। দুই একটি কথার পর সেই মহাত্মা তাহাদিগকে স্বস্থানে গমনের আদেশ দিলেন — তাঁহারা নীচে নামিয়া আসিলেন। পরদিবস বিজয়কৃষ্ণ একাকী পর্বত শীর্ষে আরোহণ করতঃ মহাত্মার আবার দর্শন পাইলেন। দেখিলেন তাঁহার নয়ন হইতে এক অপূর্ব জ্যোতি বাহির হইতেছে। বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিলে তিনি বিজয়কৃষ্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিলেন যে তিনি একজন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। মহাত্মা বলিলেন, "ওঁ ব্রাহ্মধরম্। ব্রাহ্মধরম্ হাম জান্তা হায়। কলকাতামে ব্রাহ্মসমাজ হায়, ইত্যাদি।" তাঁহার প্রত্যেক কথায় বিজয়কৃষ্ণ আবিষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন -অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে সংজ্ঞা হারার মত হইয়া গেলেন। তখন পিতা যেমন শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করেন সেই মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণকে তদ্রূপ অঙ্কে ধারণ করতঃ শক্তি সঞ্চার করিয়া দীক্ষা দান করিলেন শিক্ষা দিলেন সাধন প্রণালী। বিজয়কৃষ্ণ গুরুদেবকে প্রণাম করিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে চৈতন্যোদয় হইতে চোখ মেলিয়া তিনি আর গুরুদেবকে তথায় দেখিতে পাইলেন না। (পরবর্তী কালে অবশ্য যখন তখন দরকার হইলেই সেই মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইতেন ও যথাকর্তব্য উপদেশ দিতেন)। যা'হক দীক্ষাপ্রাপ্তি মাত্র বিজয়কৃষ্ণের প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে এক নূতন জোয়ার বহিতে লাগিল। এ হল ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসের কথা। ১৮৮৭ খ্রীঃ-র ঢাকা সাধারণ সমাজের

সাংবাৎসরিক উৎসবের দিন বিজয়কৃষ্ণ বেদীতে বসিয়া আর সমাজের পূর্ব প্রণালীমত উপাসনা করিতে সক্ষম হইলেন না। উপাসনা করিতে বসিয়া নারদ, বাল্মীকি, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতির শুভাগমন দেখিয়া তাঁহাদের স্তবস্তুতিতে ভরপুর রহিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ভরপুর হইলেও ব্রাহ্মসমাজের অপরাপর সভ্যবৃন্দ উহাতে ভরপুর হইবেন কেন? বরং উহা তাহাদের উদ্বেগের কারণ হইল। ঐ উৎসব অন্তে বিজয়কৃষ্ণ কিছুদিনের জন্য শান্তিপুরে যান। এদিকে ধূমায়িত বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুর থাকিতেই ঢাকা পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার সম্বন্ধীয় নীতি সম্বলিত ঐ পত্রখানির উদ্দেশ্য ছিল বিজয়কৃষ্ণের ভ্রম সংশোধন করিয়া দেওয়া। বিজয়কৃষ্ণ তাহার উত্তরে লিখিলেন—আমি যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি উহা ত্যাগ করিতে পারিব না। আপনাদের নিয়মাবলী মানিয়া আর প্রচারক নিবাসে থাকিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম প্রচার হইতে আমি কখন বিরত হইব না—উহা আমার জীবনের ব্রত। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়াই আমি আমার জীবনপাত করিব (করিয়াও ছিলেন তাহাই)।

বিরুদ্ধবাদীরা বিজয়কৃষ্ণকে ঐরূপ সরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াও তুষ্টি লাভ করিতে পারিলেন না, তাহারা তাঁহার পূর্বকৃত কার্য্যকলাপের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় এই সকল গোলযোগের বিষয় অবগত হইয়া বিজয়কৃষ্ণকে পত্র দিলেন—ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্রব ত্যাগ কর। অদ্বৈত প্রভুও স্বপ্নযোগে ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর বিজয়কৃষ্ণ গুরুদেবের আদেশ নিয়া পত্রদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

পদত্যাগ পত্র

সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-প্রেম-মঙ্গলময়, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে দিব্য চক্ষে দর্শন করা যায় এবং তাহাই ব্রাহ্মধর্মের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। তাঁহাকে

নিয়ত দেখা যায় ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা দিব্যাবস্থা সম্ভোগ করা সম্ভব। এক কথায় তাঁহাকে লাভ করিয়া নিয়তই তাঁহার সত্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া সমস্ত কর্ম করা ও জীবন যাপন করাই ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ।

(১) এইরূপ ব্রহ্মলাভ কেবল মানুষের চেষ্টায় বা সাধনায় হয় না। সম্পূর্ণ তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য সাধন ভজন করিলে যথা সময়ে সেই অবস্থা প্রাণে অবতীর্ণ হয়। এই জন্য তাঁহার চরণেই আমার ধর্মজীবনের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া তাঁহারই প্রদর্শিত যোগসাধন পথ অবলম্বনে গত কয়েক বৎসর চলিয়া আসিতেছি। পরমহংস বাবাজীর (মানস সরোবরের ব্রহ্মানন্দ পরমহংস) উপদেশানুসারে যোগপিপাসু ব্যক্তিগণের মঙ্গলার্থে উক্ত সাধন পথে তাহাদিগকে উপদেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

(২) এ সাধনে বাহিরের কিছুর সহিত সংস্রব নাই ; ইহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বস্তু। তবে কিছুদিনের জন্য ভূতশুদ্ধি করণোদ্দেশ্যে অনেককেই প্রাণায়ম করিতে হয়। কিন্তু উহা আমাদের সাধন নয়।

(৩) এই জন্য সাধকমণ্ডলীর বহির্ভূত লোকদিগের সম্মুখে আমরা সাধন করি না। তাহারা ইহার ভিতরের তত্ত্বকথা কিছু বুঝিবে না, কেন না বাহিরের প্রাণায়ামটুকু দেখিয়া সাধনের প্রতি অশ্রদ্ধা হইলে তাহাদেরই আত্মিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

(৪) কোনরূপ অহঙ্কার বা অন্য পাপাচার, পাপচিন্তা, পাপকল্পনা দ্বারাও এ সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। আমরা কোন সম্প্রদায় বিশেষ মানি না ; হিন্দু, পৌত্তলিক, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খৃষ্টান, মুসলমান এবং ব্রাহ্মসমাজের লোক যে কেহ আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থী হইলে, তিনি সাধন পাইতে পারেন, এবং সাধন করিতে থাকিলে তাঁহার সমস্ত ভ্রম, অজ্ঞানতা, পাপ, নীচতা ও কুসংস্কার ব্রহ্ম কৃপায় দূর হইয়া তিনি পবিত্র হইবেন।

(৫) ইহাতে গুরুবাদের লেশমাত্র নাই। ঈশ্বর স্বয়ং ইহার গুরু; আর সকলেই তাঁহার উপদেষ্টা ও তন্নিযুক্ত পথপ্রদর্শক মাত্র। যেমন তিনি বৃক্ষ লতা, গ্রহ উপগ্রহ পর্ব্বতাদি উপায় দ্বারা নানাভাবে শিক্ষা দেন, তদ্রূপ মনুষ্যারূপ উপায় দ্বারাও ধর্মশিক্ষা দিয়া থাকেন! এজন্য আমরা সমস্ত পদার্থ ও মনুষ্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই এই যোগশক্তি বর্তমান আছে। এই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য একজন জাগ্রত শক্তিশালী মনুষ্যের সাহায্যের আবশ্যক; এবং তদ্ভিন্নও নিতান্ত ব্যাকুলতা থাকিলেও অন্যান্য অবস্থা ঠিক অনুকূল হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের শক্তিলাভ করিতে পারেন; কিন্তু সেরূপ অবস্থা অতি বিরল। সুতরাং মনুষ্যের সাহায্যের নিতান্ত আবশ্যকতা আছে। যেমন চক্ষের দৃষ্টিশক্তি ভগবান দিয়াছেন কিন্তু উহাতে যদি কোন কুটা পড়ে তাহা অন্যের দ্বারা না উঠাইলে চলে না।

লেখকের মন্তব্য :—উপরোক্ত গুরুবাদ শব্দটি, কেহ কেহ মনে করেন, একটি দ্বিধার সৃষ্টি করিয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ পূর্বে বলিয়াছেন, "আমরা গুরুবাদ মানি না।" পরে তিনি গুরু বরণ করিয়াছেন ও গুরুরূপে বৃতও হইয়াছেন। সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে থাকার সময় একদিন এক ভদ্র লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কি সেই বিজয়কৃষ্ণ যিনি বলিয়াছিলেন আমি গুরুবাদ মানিনা?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি সেই বিজয়কৃষ্ণই বটে, তবে তখন যাহা বুঝিয়াছিলাম তাই বলিয়াছি এখন যাহা বুঝিতেছি তাহাই বলিতেছি।" ভদ্রলোক সে কথায় সন্তুষ্ট না হওয়ায় বিজয়কৃষ্ণ আপনার ঘার বাড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "তখনকার ভুলের জন্য এখন আমার কান দুটা মলিয়া দিয়া যান।" আবার এখানে দেখিতেছি তিনি বলিতেছেন, "আমাদের সাধনে গুরুবাদের লেশমাত্র নাই।" ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ অতি সোজা পূর্বের গুরুবাদে ছিল অহমিকা-ত্রাণকর্তা বোধ, পরবর্ত্তী গুরুবাদে আছে—সেব্য সেবকতা। গুরু সেবক-শিষ্যের হৃদয়মন্দির মার্জনা করিয়া তাহাতে পরমগুরু ভগবানের

প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়কৃষ্ণকে শিষ্য পরিবেষ্টিত দেখিয়া একদিন এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ইহারা কি আপনার শিষ্য?" বিজয়কৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, "এদেরে নিয়া আমি সাধন ভজন করি।" তারপর কেহ কি কখন দেখিয়াছেন যে গুরু শিষ্যের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে? —গুরু শিষ্যের পায়ের ধূলা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াইয়া দেন? বিজয়কৃষ্ণের পক্ষে উহা সম্ভব ছিল এবং তিনি উহা করিতেনও। অপর পক্ষে দেখা যায় তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "আপনারা যেমন তেমন লোক নন-আপনারা সদ্‌গুরুর আশ্রিতজন।" বিজয়কৃষ্ণের পক্ষে সকল সম্ভব।

(৬) পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদের ন্যায় ধর্মোপদেষ্টাদিগকেও প্রগাঢ় ভক্তি, শ্রদ্ধা করা ধর্ম সম্মত। পদধূলি লওয়া সম্বন্ধে আমাদের কোন নিষেধ নাই। আত্মার যেরূপ অবস্থায় পদধূলি গ্রহণের ইচ্ছা হয়, সেই বিনীত অবস্থাটি অতি সুন্দর ও উপকারী। এজন্য অন্যের উপকার হইতেছে দেখিলে কেহ আমার পদধূলা লইলে আমি তাহাতে বাধা দিই না। আমিও সকলের পদধূলা গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাকে কেহ প্রণাম করিলেই আমি সেই প্রণাম বিশ্বগুরুর প্রাপ্য অর্থে "জয় গুরু জয় গুরু" বলিয়া থাকি—প্রণাম স্বয়ং গ্রহণ করিনা।

লেখকের মন্তব্য :— যে মানভূমিতে দাঁড়াইয়া ভক্ত সমাধিমগ্ন কুকুরের পায়ে আপন মাথা লুটাইতে পারে তাঁহার উচিত ও অনুচিতের মাপকাঠি সাধারণের হাতে তৈয়ারী হয় না।

(৭) আমরা অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন উচিত মনে করিনা। তাহাতে নানা শারীরিক ব্যাধি সংক্রামিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন তাহাতে আধ্যাত্মিক অবনতিও হয় একথা সাধু মহাত্মারা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন এবং তাহা পরীক্ষিত সত্য। তবে পিতামাতা গুরুজন যখন আদর করিয়া কিছু দেন তাহা এবং যখন কোন শ্রদ্ধেয় ধর্মাত্মার ভুক্তাবশেষকে প্রসাদ বলিয়া মনে হয় তাহা আহার করিলে হানি নাই, বরং উপকারই হইয়া থাকে। এজন্য সকল

সম্প্রদায়ের ধার্মিক লোকের প্রসাদ ভোজন উচিত মনে হইলে করিয়া থাকি।

(৮) দেবতার মন্দিরে কালী, দুর্গা বা অন্য কোন প্রতিমার সম্মুখে যদি আমার ব্রহ্মস্ফুর্ত্তি হয়, তবে সেইখানেই আমি আত্মহারা হইয়া যাই ও আমার ইষ্টদেবতা মনে করিয়া হয়ত সেখানে গড়াগড়ি দিয়া চরিতার্থ হই। আমার ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং আমি যেখানেই তাঁহার দর্শন পাই, সেই খানেই মুগ্ধ হই, স্থানের বিচার আসে না।

(৯) কালী, দুর্গা সকল নামেই ভক্ত ভগবানকে ডাকিতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ দেখি না। এজন্য আমরা যখন যে নামে প্রাণে আরাম পাই, তখন তাই বলিয়াই ডাকিয়া থাকি, কিন্তু সমাজের উপাসনার সময় কোথাও এই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান সময়ে ঐরূপ করাও উপযুক্ত মনে করি না।

(১০) রাধাকৃষ্ণের ভাবের মত ধর্ম ও যোগপথের সহায়ক অন্য কোন ভাব নাই মনে করি। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা পরমেশ্বর; এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আমি ঐ ভাবসাধনের চেষ্টা করি ও যাহারা ঐ আধ্যাত্মিক ভাবে উপকার পান, তাহাদিগকে লইয়া একত্রে রাধাকৃষ্ণের গান করিয়া থাকি। তবে ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনার সময়ে কখনও ঐ নাম গ্রহণ করি নাই; এবং বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ করা উচিতও মনে করি না।

এ আমাদের যোগসাধন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বাহিরের কথা। ভিতরের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। (তিনি উহা আপন শিষ্যদেরও বলিতেন না। তবে কালে শিষ্যদের মধ্যে তাহা ফুটিয়া উঠিত। মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর কৃপা বইখানিতে উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইবেন।) এই সকল বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্যের সহিত আমার মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। যাহা সত্য বুঝিব, তাহাই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব—এই জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য আমার এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত ও

বিশ্বাস প্রচারের হানি হইতে পারে আশঙ্কা করেন বলিয়া আমি উক্ত সমাজের সহিত সমস্ত বাহ্যিক সংস্রব ত্যাগ করিলাম, আন্তরিক যোগ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল।

কেবল প্রচারক পদ প্রভৃতি সামাজিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিলাম। এখন অবধি ধর্মপ্রচারের সমস্ত কার্য্য আমার নিজের দায়িত্বে করিতে থাকিব। আমার একটি কথাও এখন অবধি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিয়া পরিগণিত না হউক।

আমি মনে করি যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম এবং সমস্ত মানব-মণ্ডলীর মধ্যেই এই সত্য লাভ করা যায়। এই জন্য ব্রাহ্মধর্মকে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করি। পরমেশ্বর এক, তাহার ধর্মও এক। মনুষ্যের ভ্রম প্রমাদ ও রুচি অনুসারে নানা প্রকার দল ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত ধর্মের দল বা সম্প্রদায় নাই। আমি সেই সারসত্য অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতেছি এবং করিব। আমি সমস্ত মনুষ্য সমাজের দাসানুদাস কিন্তু কোন দল বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি। দয়াময় প্রভু আশীর্ব্বাদ করুন, এই সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম যেন চিরদিন প্রচার করিতে পারি।

নিবেদক—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ সন।

বিজয়কৃষ্ণের ঐ পত্র পাইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সিটি কলেজে (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট) একা সভা ডাকিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়া স্বকীয় অভিমত ব্যক্ত করিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিবেন শুনিয়া কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু সভাস্থলে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, আমি গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম। হায়, হায়। বড় দুঃখের বিষয় এখন দেখিতেছি তিনি মোহগ্রস্ত হইয়াছেন।

বিজয়কৃষ্ণের উক্ত পদত্যাগ পত্র গৃহীত হওয়ার পর তত্ত্ব কৌমুদীতে প্রকাশ করিল—গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের সেবা অতি অল্পলোকই করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য বার বার যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছেন আমাদের মধ্যে এরূপ কেহ করেন নাই। তাঁহার সত্যপ্রিয়তাতে আমাদের যেরূপ বিশ্বাস, তাহাতে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যেদিন তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পাইবেন সেই দিনই বিষাক্ত দ্রব্যের ন্যায় তাহা বর্জ্জন করিয়া আবার সাধারণ সমাজকে আলিঙ্গন করিবেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন সামান্য মতভেদের জন্য আমরা প্রেম ও কৃতজ্ঞতার ঋণ বিস্মৃত না হই।

কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের সে "ভুল" আর ভাঙ্গিল না। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাতে যে ভুল দেখিয়াছিলেন তৎকালীন ও পরবর্তী ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ সে ভুলকেই সাদরে আহ্বান করিয়া নিলেন। এই আহ্বানকারীদের ভিতর আছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ব্রজবিদেহী কাঠিয়া বাবা, যোগীবর গম্ভীরানাথ, ভোলাগিরি মহারাজ, কালনার ভগবানদাস বাবাজী, বারদীর ব্রহ্মচারী, পুরীর ভূতানন্দ স্বামী, অর্জ্জুনদাস বাবাজী, নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজী, বৃন্দাবনের বৈষ্ণব - শিরোমণি শিরোমণি মহাশয়, শ্রীশ্রীরামঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ, রামদাস বাবাজী, সন্তদাস বাবাজী ও এখন চোখে দেখিতেছি শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। তারপর বিবেকানন্দ যেদিন চিকাগো ধর্মসভা হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করেন কলিকাতার লোক তাহাকে সেদিন খোলা গাড়ীতে বসাইয়া অশ্বের পরিবর্ত্তে নিজেরাই গাড়ী টানিয়া কলিকাতার পথ ভ্রমণ করিতেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ তখন ৪৫ নং হ্যারিসন রোডে থাকিতেন। বিজয়কৃষ্ণ সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য যখন খোলা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, পুরুষসিংহ বিবেকানন্দ অমনি দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দুই হাত জুড়িয়া নমস্কার জানাইলেন। বিবেকানন্দ আমেরিকার যাওয়ার প্রাক্কালে যখন বিজয়কৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে

আসেন বিজয়কৃষ্ণ তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি আপনার জয়যাত্রা বাঞ্ছা করি।"

ফাটল ধরিয়াছিল কোথায় ও কখন

অর্দ্ধশতাব্দীর ভিতর ব্রাহ্মসমাজের আদিতে আদি ব্রাহ্মসমাজ, মধ্যে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ ও অন্তে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অর্থাৎ তিনটি মতিগতি পরিবর্তনশীল প্রবাহ—ইংরাজীতে বলা যাইতে পারে iron on the anvil (কামারের নেহাইর উপরের তপ্ত লৌহ।) সুতরাং পৃথক পৃথক পর্য্যায়ে পরস্পরের মনের মিল ও অমিল যথেষ্টই ছিল। কর্ণধারই পোতের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন। সে হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের এবং কেশবচন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার ছিলেন। অবশ্য ভারতীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভিতর আর একটি ধাপ ছিল—সঙ্গত সভা। উহাকে পার্ব্বত্য প্রদেশের চড়াই বা উতরাই যে কোন নামে অভিহিত করা যায়।

ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে আমি অবহিত নই। তবে যতদূর জানি মনে হয় সেটি অফিসের এক কর্মকর্তা কর্তৃক নবাগত কর্মকর্ত্তাকে শপথ পাঠ করানোর মত; যাহার জন্য বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কাজ করিতেছেন শুনিয়া পরমহংসদেব একদিন বলিয়াছিলেন "চাপরাশ পেয়েছ কি?" ব্রাহ্মসমাজে গুরুশিষ্যে এক বুনিয়াদী সম্পর্ক ছিল বলিয়া আমার মনে হয় না। দেবেন্দ্রনাথের নিকট বিজয়কৃষ্ণের দীক্ষা গ্রহণের পরই দেখিতে পাই উপবীত ধারণ ও মৎস্যাহার সম্বন্ধে গুরুশিষ্যের মতৈক্য কখন হয় নাই। এজন্য বিজয়কৃষ্ণ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মসমাজ এখন কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।" দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রের নামকরণ উৎসবেও দেখিতে পাই গুরুদেব শিষ্যের ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের মর্য্যাদা দিতে পারেন নাই। সে ঘটনাটি ছিল এইরূপ।

একদিন বিজয়কৃষ্ণ সমাজগৃহের দ্বিতলে বসিয়াছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি গরদের একখানি বস্ত্র; একটি স্বর্ণ অঙ্গুরীয় ও তৎসহিত দেবেন্দ্রনাথের বৈবাহিক মহাশয়ের স্বাক্ষরিত এক পত্র নিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। পত্রে লেখা ছিল—অদ্য সায়ংকালে আমার পৌত্রের নামকরণ হইবে—আপনি উপাচার্য্যের কাজ করিবেন এবং প্রেরিত বস্তু সকল গ্রহণ করিবেন।

এইরূপ উপঢৌকন গ্রহণে ব্রাহ্মসমাজে পৌরহিত্য প্রথা প্রচলিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় বিজয়কৃষ্ণ দুঃখের সহিত উহা প্রত্যাখান করিলেন। ইহাতে ঠাকুরমহাশয় বিজয়কৃষ্ণের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের চরিত্রে উহার প্রতিক্রিয়া কেহ কখনও দেখেন নাই।

দ্বিতীয় কর্ণধার কেশবচন্দ্র। ১৮৬৭ খ্রীঃ-এ ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কেশব সেন বিজয়কৃষ্ণ ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সঙ্গে নিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে এলাহাবাদ যান। উক্ত উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র সেখানে যে সকল বক্তৃতা দেন উহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু উহাতে একটি অবাঞ্ছিত ফল দেখা দিল। কতিপয় সভোর কথাবার্ত্তা ও আচরণে কেশবচন্দ্র ভগবান ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী এক পুরুষ বলিয়া একটা অস্পষ্ট ভাব দেখা দিল। এই মধ্যবর্ত্তীভাব একটু পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে বিজয়কৃষ্ণ ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কেশববাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন না কেন?" কেশবচন্দ্র উহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না।" এই ব্যাপার নিয়া এক অশোভনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং বিজয়কৃষ্ণ কোন রকমে বিরুদ্ধবাদীদের প্রহার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা—১২৭৮ সনে (১৮৭১ খ্রীঃ) ব্রাহ্মগণের প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করেন। তাহাতে পাত্রের ন্যূনকল্পে অষ্টাদশ ও কন্যার পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত হয়। কেশব-

বাবু কোচবিহারের রাজার সহিত স্বীয় কন্যার সম্বন্ধ স্থির করাতে ব্রাহ্মসমাজে এক হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল, কারণ বর ও কন্যা উভয়ের বয়ঃক্রম নির্দ্দিষ্ট বয়ক্রম হইতে ন্যূন ছিল। এ বিবাহের অন্যতম আপত্তির কারণ হইল যে এই বিবাহ হিন্দুমতে সম্পন্ন হইবে এইরূপ স্থিরীকৃত হইল। ব্রাহ্মগণ পত্রাদিদ্বারা কেশববাবুকে তাহাদের আপত্তি জানাইলেন কিন্তু কেশববাবু উহাতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করিলেন না, বরং ইহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া ঘোষিত হইল। অতঃপর কেশববাবুর কন্যা নিয়া কোচবিহারে গিয়া হিন্দুমতে তাহার বিবাহ দিলেন। ব্রাহ্মবিবাহ যখন আইন বিধিবদ্ধ হয় তখন কেশববাবু ব্রাহ্মমন্দিরের বেদী হইতে প্রচার করিয়াছিলেন ইহা কোন রাজবিধি নহে—ইহা ঈশ্বরের আদেশ।

কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণে ধর্ম বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিরও তারতম্য বর্তমান ছিল। ১২৮২ সনের মাঘোৎসবের পর ভারত আশ্রমে কেশববাবু সাধন শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি ব্যক্ত করেন যে, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনটির মধ্যে যাহার মনে গতি যেদিকে প্রবল তদনুরূপ সাধনে তিনি মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন।

প্রীতির্যতো যস্য সুখঞ্চ যেন,
সম্যগ্ ভবেত্তদ্রসিকস্য তস্য
তৎসাধনং শ্রেষ্ঠতমং সুসেব্যং
সদ্ভির্মতং প্রত্যুত সাধ্যরূপম্। ব্র, ডাঃ ২।১৫২

উক্ত বক্তৃতার পর বিজয়কৃষ্ণ ভক্তিযোগ শিক্ষার জন্য সংযম ব্রত গ্রহণ করিয়া কায়মনবাক্যে উহার সাধন করিতে লাগিলেন। এইভাবে এক বৎসর অতীত হইলে একদিন কেশববাবু বিজয়কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "তুমি ভক্তিযোগে সিদ্ধ হইয়াছ।" এই কথা শুনিয়া বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা
আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচি ॥
আসক্তিস্তৎগুণাখ্যানে প্রীতি স্তৎবসতিস্থলে
ইত্যাদয়োইনুভাবাঃ স্যুর্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে ॥

ভাবের অঙ্কুর হইলে ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব, বৈরাগ্য, মানশূন্যতা, ভগবৎ প্রাপ্তি বিষয়ে বলবতী আশা, তাঁহার অপ্রাপ্তি হেতু উৎকণ্ঠা তাঁহার নাম গানে রুচি, তাঁহার গুণ বর্ণনে আসক্তি, তাঁহার বসতিস্থলের প্রতি প্রীতি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আমাতে উহার কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। কেশববাবু নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের পর

ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ কি করিলেন? ঐ কথাই আমি এখন বলিতেছি। বিজকৃষ্ণের ভরা যৌবনে যখন অহম্ ব্রহ্মাস্মি ভাবটি পূর্ণিমা অমাবস্যার জোয়ারের মত তরতর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল তখন শ্যামসুন্দরকেই তাঁহার পেছনে ছুটিতে হইয়াছিল—নানা অছিলায়। একদিন শ্যামসুন্দর আসিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার মাথার চূড়া গড়াইয়া দাও।" বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, "আমি টাকা পাব কোথায়।" শ্যামসুন্দর ঘরের ছেলে, ঘরের সকল খবর রাখেন, বলিলেন—তোর খুড়ীমার ঝাঁপির ভিতর ১৭ টি টাকা আছে। খুড়ীমার গুপ্তধন বাহির হইয়া আসিল।

আতা বুনিয়া ঠাকুরবাড়ীর চিরাচরিত প্রথা ঠাকুরকে কোলে করিয়া ভিতরের বাড়ীতে আনিয়া আহার করাইতে হয়। একদিন

এ'রূপ কোলে করিয়া নিয়া আসার সময় পুরোহিত মহাশয়ের একটু অসাবধানতা বশতঃ দেয়ালে ঠেকিয়া শ্যামসুন্দরের একটি আঙ্গুল ফাটিয়া গেল। বিজয়কৃষ্ণ তখন কলিকাতায়। শ্যামসুন্দর কলিকাতা গিয়া বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন, "একবার শান্তিপুরে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যা—আমার আঙ্গুলে চোট লাগিয়াছে; বড় ব্যথা করিতেছে।" তখন রাণাঘাটের পর আর রেল লাইন ছিল না। বিজয়কৃষ্ণ রাণাঘাট হইতে পায়ে হাটিয়া যখন শান্তিপুর পৌঁছিলেন তখন রাত দুপুর। বাড়ীর লোকজনদের ডাকিয়া জাগান হইল—বিজয়কৃষ্ণ সমস্ত কথা বলিলেন। কিন্তু বিধর্ম্মীর কথায় কেহ কান দিলেন না। বিজয়কৃষ্ণ শ্যামসুন্দরকে নিয়া জাগিয়া রহিলেন। পরের দিন মঙ্গল আরতির সময় সকলে দেখিতে পাইলেন—শ্যামসুন্দরের একটি আঙ্গুল কাটা।

দিন সকলের সমান যায় না। (এইসা দিন নেহি রহেগা—বিজয়কৃষ্ণের লব্ধ সত্য) এবার বিজয়কৃষ্ণেরই শ্যামসুন্দরের পেছনে পেছনে ছুটিবার দিন আসিয়াছে। তিনি শ্যামসুন্দরের দিকে সজল নয়নে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামসুন্দর এই যদি তোমার মনে ছিল তবে আমাকে এত ঘুরাইলে কেন?" স্পষ্টবাদী শ্যামসুন্দরের উত্তর দিতে একটুও বিলম্ব হইল না—বলিলেন "ঘুরাইয়াছি—বেশ করিয়াছি! আমার ইচ্ছা। মেয়েরা পুরান অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া নূতন হাল ফ্যাসনের গহেনা তৈয়েরী করে না?"

বিজয়কৃষ্ণের সারাজীবন এক রহস্য আবৃত। তিনি গীতোক্ত যুক্ত বৈরাগ্যের এক প্রতিমূর্ত্তি—তিনি নিজের সম্বন্ধে অনাসক্তভাবে যথাপ্রয়োজনে বিষয় স্বীকার করিয়াছেন—পরবাসন নারীর মত সমস্ত প্রাণটি শ্রীকৃষ্ণে দিনযামিনী অর্পণ করিয়া সংসারী সাজিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণের দীক্ষাদান ব্যাপারটিও ছিল অদ্ভুত কোথাও কাহার বাড়ী গিয়া যাচিয়া দীক্ষা দিয়াছেন যেন তাঁহারই মাথা ব্যথা, আবার কেহ সাধিয়াও দীক্ষা পান নাই। এ সম্পর্কে তিনি জনৈক শিষ্যকে

বলিয়াছিলেন—তোমাদের অফিসে যেমন প্রমোসনের লিষ্ট থাকে দীক্ষাদান ব্যাপারেও ভগবানের তেমন লিষ্ট আছে—উহাতে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই জানিবে।

বিজয়কৃষ্ণ শাস্ত্র ও মহাপ্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও স্বহস্তে বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ঐ বিষ এত তীব্র ছিল যে উহাতে মানুষ কেন একটি পূর্ণ বয়স্ক হাতীরও তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিয়োগ হইতে পারিত কিন্তু ক্ষমার প্রতিমূর্ত্তি বিজয়কৃষ্ণ সে বিষের জ্বালা সহ্য করিয়াও আরও কয়েকটি দিন দেহে রহিয়া গেলেন যাহাতে বিষদাতা দুষ্কৃতিকারীগণ রাজদ্বারে দণ্ডিত না হয়।

দেহরক্ষার কিছুদিন পূর্বে শিষ্যদিগকে বলিয়া গেলেন, "আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, জগন্নাথ তোমাদের ভার গ্রহণ করিলেন।" এমন দরদী প্রভু আর কে আছেন? ইতিপূর্বে তিনি তাহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "ধর্মের ছয়টি স্তর—প্রথম নীতি ধর্ম। বহু জন্ম এই ধর্ম পালন করার পর মানুষ পঞ্চোপসনার অধিকারী হয়। বহুজন্ম পঞ্চোপসনার পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়। ব্রহ্মজ্ঞান ভেদ করিতে পারিলে পরমাত্ম তত্ত্বে উপস্থিত হয়। সাধন বলে এই পরমাত্ম তত্ত্ব ভেদ করিতে পারিলে মানুষ রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বে পৌঁছে। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ভেদ হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্বে পৌঁছায় গৌরাঙ্গ তত্ত্বের পর আর তত্ত্ব নাই। তোমাদিগকে কোন কথা বলিলে ত শুনিবে না; এজন্য তোমাদের মধ্যে কেবল শক্তি সঞ্চার করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সকল তত্ত্ব প্রকাশ পাইবে।"

এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে স্থাবর জঙ্গম যাঁহারাই আসিয়াছেন তাঁহাদেরই জীবন মধুময় হইয়া গিয়াছে। গেণ্ডারিয়া আশ্রমের আম্রবৃক্ষ মধুবর্ষণ করিত; তাঁহার ভোজনের সময় মাকড়সাগুলি জালে বসিয়া আনন্দে দোল খাইত; আরশুলা ইঁদুর পীপড়া আনন্দে ছুটাছুটি করিত। আশ্রমের কেলে কুকুরের কীর্ত্তনে সমাধি হইত — রাণীসাহ বাচ্চা না দিয়াও সময় অসময় তাঁহার জন্য দুধ দিত; বিষধর সর্প তাঁহাকে অমৃত পরিবেশন করিত। ছোট একখানি

টুলে বসিয়া তিনি পায়খানা যাইতেন। ঐ টুলখানি বদলাইবার প্রস্তাব হইলে টুলখানি আসিয়া নিবেদন করিয়াছিল, "আমাকে আপনার সেবা হইতে বঞ্চিত করিবেন না।" শ্রীক্ষেত্রে যেদিন তিনি দেহরক্ষা করেন সেদিন শতশত বানর সপরিবারে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল। সে ছিল ১৩০৬ সন (১৮৯৯ খ্রীঃ) ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার এক বিয়োগাতুরা কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি। এই দিব্য পুরুষের সমাধি বেদীতে প্রস্তরের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছিল একখানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। [illegible]

শিবেন্দ্র নাথ ঘোষ

সত্যপ্রাণ

বিজয়কৃষ্ণ